তিন গোয়েন্দা সিরিজ

ভীষণ অরণ্য ২

রকিব হাসান

স্বীকারোক্তি:
বাংলা e-book-এর পাঠকেরা ছড়িয়ে আছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে এবং সব জায়গার ইন্টারনেট কানেকশনের গতি সমান নয়। তাই চেষ্টা করতে হয়েছে ফাইলের সাইজ যথা সম্ভব ছোট রাখার। ফলে অনিবার্য ভাবে কমাতে হয়েছে ছবির Resolution. পাঠকের এই অসুবিধার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

Best Viewed at 125%

Scanned by: Shabab Mustafa

Send your feedback at:
Shabab.mustafa@gmail.com

ভীষণ অরণ্য ২

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৮৮

এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না মুসা।

লম্বা নাকে ফাঁস লাগিয়েই ধরা যায় কুমিরটাকে। এত বড় দানব সচরাচর চোখে পড়ে না।

কুমিরের চাহিদা কেমন, জানা নেই তার। আশা করল, অনেক দামে বিক্রি হবে। ধরতে পারলে নেবে কিভাবে, ভাবল না একবারও।

কুমিরের নাক অনেক লম্বা, অ্যালিগেটরের মত ভোঁতা নয়।

নিঃশব্দে ক্যানূর দড়ির এক মাথা গাছ থেকে খুলে নিয়ে ফাঁস বানাল মুসা। পা টিপে টিপে এগোল ঘুমন্ত সরীসৃপের দিকে।

আস্তে করে ফাঁস গলিয়ে দিল চোখা নাকটায়, তারপর হ্যাঁচকা টান। লাফিয়ে সরে গেল।

রাগে হিসিয়ে উঠল কুমির। মুসাকে ধরার জন্যে লাফ দিতেই দড়িতে লাগল টান। দ্বিধায় পড়ে গেল। লেজের ঝাপটায় পানি তোলপাড় করে ঘুরে গিয়ে পড়ল খালের মাঝখানে। টানটান হয়ে গেল ক্যানূতে বাঁধা দড়ি।

ঝাঁকুনির চোটে ঘুম ভেঙে গেল আরোহীদের। চেঁচাতে শুরু করল গলা ফাটিয়ে।"

দড়ি ছাড়ানোর জন্যে একবার এদিকে ঘুরে টান মারছে কুমির, একবার ওদিক। ঝটকা দিয়ে বার বার ঘুরে যাচ্ছে ক্যানূর নাক। টালমাটাল অবস্থা।

কিছুতেই দড়ি ছাড়াতে না পেরে খালের মাঝখান দিয়ে সোজা ছুটতে শুরু করল কুমির। টেনে নিয়ে চলল ক্যানূটাকে।

খানিক দূর গিয়ে বোধহয় মনে করল, ক্যানূটাই তাকে তাড়া করছে, যত শয়তানী ওটারই। ঘুরে এসে তাই আক্রমণ করে বসল ওটাকে। বিশাল হাঁ করে কামড় লাগাল একপাশে। মড়মড় করে উঠল কাঠ। হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে না নিলে আরেকটু হলে জিবার হাতটাই গিয়েছিল।

শক্ত কাঠে কামড় দিয়ে বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে আক্রমণের ধারা পাল্টাল কুমির। লেজের বাড়ি মারতে শুরু করল। থরথর করে কেঁপে উঠল ক্যানূ।

দিশেহারা হয়ে গেছে মুসা।

চেঁচামেচিতে অন্যদেরও ঘুম ভেঙেছে। লাফিয়ে গিয়ে মনট্যারিয়াতে উঠেছে সবাই। মুসাও উঠল। ক্যানূর দিকে ছুটল নৌকা।

কিছুতেই দড়ি খসাতে না পেরে আবার সোজা ছুটেছে কুমির। ধরা যাবে না

ওই দানবকে। দড়িটা কাটতে পারলে এখন বাঁচা যায়। ছুরি বের করল জিবা।

কিন্তু দড়ি কাটার আগেই ডুব দিল কুমির। পানি ওখানে গভীর। টানের চোটে ক্যানুর গলুই গেল ডুবে। খাড়া হয়ে গেল আরেক গলুই। ঝুপঝাপ করে পানিতে পড়ল মানুষেরা, হাত-পা ছুঁড়ছে অসহায় ভঙ্গিতে। আতঙ্কে চিৎকার করছে। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পাশের বনের বানর আর পাখির দল।

সর্বনাশ! পানিতে খেপা কুমিরের সঙ্গে চারজন মানুষ। রাইফেল তুলল মুসা।

'না না!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'কার গায়ে লাগে ঠিক নেই।'

'কি করব তাহলে?'

'দড়ি কাটতে হবে। ছাড়া পেলে হয়তো পালাবে। আর কোন উপায় নেই।'

দ্রুত মনস্থির করে নিল মুসা। অঘটন সে ঘটিয়েছে, তাকেই করতে হবে যা করার। রাইফেল রেখে একটানে কোমর থেকে ছুরি খুলে নিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে।

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

পানিতে রক্ত। জিবা আর তার দুই সঙ্গীর মাথা দেখা যাচ্ছে পানির ওপরে, আরেকজন নেই। কুমিরে টেনে নিল?

দড়িতে ঢিল পড়েছে। কাত হয়ে ভেসে উঠল ক্যানু। দড়িতে পোঁচ মারল মুসা।

হঠাৎ ক্যানুর খানিক দূরে পাগলা ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠল কুমির, ভারি কাঠের মত এক গড়ান দিয়ে আবার ডুবে গেল। তার কাছেই ভাসল তৃতীয় ইনডিয়ান লোকটার মাথা। হাতে শিকারের বিশাল ছুরি, তাতে পানি মেশানো হালকা রক্তের ধারা। তাকে কুমিরে ধরেনি, মরিয়া হয়ে সে-ই কুমিরকে ছুরি মারছে।

তাড়াহুড়ো করে ক্যানু সোজা করে তাতে চড়ে বসল চারজনে। মুসাকে টেনে তোলা হলো মনট্যারিয়ায়। পানিতে নতুন বিপদ। রক্তের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে।

ডুবে গিয়েছিল, আবার ভেসে উঠল কুমির। দাপাদাপি করছে, অস্থির, পাগল হয়ে গেছে যেন।

পিরানহা! আমাজন নদীর আতঙ্ক।

রক্তের গন্ধে হাঙর যেমন পাগল হয়ে ছুটে আসে, পিরানহাও তেমনি আসে। ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর। বড় জোর ফুটখানেক লম্বা এই মাছ। মুখ বন্ধ রাখলে নিরীহ দেখায়। কিন্তু হাঁ করলে বেরিয়ে পড়ে দুই সারি ক্ষুরধার দাঁত।

নদীর পানিতে এমন কোন প্রাণী নেই, যে পিরানহাকে ভয় পায় না, এমনকি কুমিরও এড়িয়ে চলে। ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে ওরা, শ-য়ে শ-য়ে, হাজারে হাজারে। মোটাতাজা একটা তাপিরকে শেষ করতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগে না, পড়ে থাকে শুধু জানোয়ারটার ঝকঝকে সাদা কঙ্কাল।

কুমিরটার চারপাশে পানি যেন টগবগ করে ফুটছে। রক্তে লাল।

ইনডিয়ানরা উত্তেজিত। নৌকা থেকে মাছ ধরার বল্লম নিয়ে ক্যানু চালিয়ে চলে

গেল কাছাকাছি। দেখতে দেখতে ধরে ফেলল গোটা বিশেক মাছ। ক্যানুর তলায় স্তূপ করে রাখল। ডাঙায়ও নিরাপদ নয়, ওগুলোর কাছ থেকে দূরে রইল ওরা।

খালের মাঝখানে ছোট এক চিলতে বালির চরা, শুকনো। গাছপালা নেই। তাতে মাছগুলো ছড়িয়ে ফেলল ইনডিয়ানরা, ছুরি দিয়ে কুপিয়ে মাথা আলাদা করল।

ভালমত দেখার জন্যে একটা হাঁ হয়ে থাকা মাথা তুলল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে খটাস করে বন্ধ হয়ে গেল চোয়াল, যেন স্প্রিং লাগানো রয়েছে। চমকে ওটা হাত থেকে ফেলে দিল সে।

রবিনের দিকে চেয়ে হাসল এক ইনডিয়ান যুবক। চমৎকার স্বাস্থ্য। সে-ই কুমিরটাকে ছুরি মেরেছিল। নাম মিরাটো। হাতের ছুরির আগা আরেকটা কাটা মাথার হাঁয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে নাড়া দিল। এত জোরে বন্ধ হলো চোয়াল, ছুরিতে লেগে কয়েকটা দাঁতের মাথা গেল ভেঙে।

ছুরিটা দাঁতের ফাঁক থেকে টেনে ছাড়াল মিরাটো। ফলার দুই পিঠেই গভীর দাগ বসে গেছে।

'নিউ ইয়র্ক অ্যাকোয়ারিয়ামে,' রবিনের মনে পড়ল, খবরের কাগজে পড়েছিল, 'একটা পিরানহা কামড় দিয়ে স্টেনলেস স্টীলের কাঁচিতে দাগ ফেলে দিয়েছিল। হাঙরের মতই স্বভাব, একে অন্যকে ধরে খেয়ে ফেলে। অ্যাকোয়ারিয়ামে এক চৌবাচ্চায় দুটো পিরানহা একসঙ্গে রাখে না। রাখলে সবলটা দুর্বলটাকে খেয়ে ফেলে।'

ইনডিয়ানরা যে মাছগুলোকে ধরেছে, কয়েকটার পিঠের মাংস নেই, খুবলে খেয়ে ফেলা হয়েছে। মিরোটো জানাল, বল্লমে গাঁথার পর ওগুলোকে তুলতে সামান্য দেরি হয়েছিল, ওইটুকু সময়েই কামড় বসিয়ে দিয়েছে অন্য পিরানহা। আরেকটু দেরি করলে বল্লমের মাথায় শুধু কঙ্কালটা উঠে আসত।

'ওই দেখো,' কঙ্কালের কথায় হাত তুলে দেখাল কিশোর।

ফুটন্ত পানি ঠাণ্ডা হয়েছে। চলে গেছে পিরানহার ঝাঁক। অল্প পানিতে পড়ে রয়েছে সাদা একটা কঙ্কাল, মিউজিয়মে দেখা প্রাগৈতিহাসিক দানবের কঙ্কাল বলে ভুল হয়।

'আমাদের গরু-ছাগলেরও ওই দশা করে,' মিরোটো বলল। 'রাতে রক্তচোষা বাদুড়ে রক্ত খেয়ে যায়, ক্ষতের চারপাশে রক্ত লেগে থাকে। সকালে যখন গোসল করতে নামে, ব্যস, হারামী মাছের ঝাঁক এসে হাজির।'

এরপর আর ঘুম হলো না কারও।

মুসা আর কিশোর গেল রক্তচাটার জন্যে একটা ক্যাপিবারা শিকার করার জন্যে। গাছতলায় আরাম করে বসে রেফারেন্স বই পড়ায় মন দিল রবিন। ইনডিয়ানরা কেউ শুয়ে-বসে গল্প-গুজব চালাল, কেউ রান্নায় ব্যস্ত।

স্বভাব যত খারাপই হোক পিরানহার, মাংস খুব ভাল। রবিন, যে ইনডিয়ানদের খাবার পছন্দ করে না, সে-ও তারিফ করল।

'কুমির ধরতে পারলে না বটে,' হেসে বলল কিশোর, 'কিন্তু ভাল নাশ্তা জোগাড় হলো।'

'তা হলো,' হাত নেড়ে বলল মুসা। 'কিন্তু আরেকটু হলে আমরাই নাশ্তা হয়ে যাচ্ছিলাম।

দুই

খানিক পর পরই গিয়ে নদীর উজানের দিকে তাকায় কিশোর। ভ্যাম্পের দলবল আসছে কিনা দেখে।

ক্বচিৎ একআধটা ইনডিয়ান নৌকা দূর দিয়ে যেতে দেখল শুধু।

হয়তো এখনও আসেইনি ভ্যাম্প। কিংবা এলেও দ্বীপ আর গাছপালার ওধার দিয়ে চলে গেছে, অভিযাত্রীদের দেখেনি। চলে গেলেও যে আবার ফিরে আসবে না ভালমত দেখার জন্যে, সেটা বলা যায় না। নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই।

রাইফেল-বন্দুক আছে অভিযাত্রীদের কাছে, তবে তারা তিনজনেই ছেলেমানুষ। ইনডিয়ানদের কাছে রয়েছে শুধু তীর-ধনুক আর বল্লম, গোটা দুই ব্লোগানও আছে। কিন্তু লড়াই লাগলে ভ্যাম্পের গলাকাটা ডাকাতদের সঙ্গে পারবে না ওই অস্ত্র নিয়ে।

তারমানে, লুকিয়ে থাকতে হবে। এই খালপাড়েই কাটাতে হবে দিনটা, রাতের আগে বেরোনো উচিত হবে না। রাত্রে চলতে অসুবিধে হয়তো হবে, কিন্তু উপায় কি?

ভরপেট খেয়ে খালের পাড়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে ইনডিয়ানরা। ক্যানুতে শোয়ার সাহস নেই কারও। কুমিরের পেটে যাওয়ার চেয়ে পোকামাকড়ের কামড় সওয়া বরং অনেক ভাল।

তিন গোয়েন্দাও শুয়ে পড়ল।

সবাই গভীর ঘুমে অচেতন, মহিলার আগমন তাই কেউ টের পেল না। এত সুন্দরী, কিন্তু তাকে দেখার জন্যে কেউ জেগে নেই।

মসৃণ কোমল হালকা বাদামী চামড়ার ওপর ঘন বাদামী গোল গোল ছাপ দিয়ে অলঙ্করণ করা হয়েছে, গোল ছাপের মাঝখানটা আবার ফ্যাকাসে। মাথাটা দেখতে কুকুরের মাথার মত। এই মাথায় ভর রেখে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে সে। প্রায় দুই মানুষ সমান লম্বা। লাল-কালো আর হলুদ আলপনা কাটা সুন্দর লেজটা পেঁচিয়ে রয়েছে গাছের ডালে।

মাটিতে থুতনি ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে লেজ খুলতে শুরু করল সে। এক মুহূর্ত খাড়া হয়ে রইল চুপচাপ, লেজের ডগা মাটি থেকে বারো ফুট উঁচুতে। আস্তে করে শরীরটা নেমে এল মাটিতে।

মাথা তুলে ঘুমন্ত শরীরগুলো দেখল সে। খাবার হিসেবে কেমন হবে যাচাই

করছে।

নিজের শরীরের তিন গুণ বড় জিনিস গিলে খাবার ক্ষমতা আছে আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম সাপ বোয়া কনসট্রিকটরের।

সারির প্রথম ইনডিয়ান লোকটার ওপর দিয়ে 'বয়ে' গেল বোয়া, এতই হালকাভাবে, টেরই পেল না লোকটা। পরের জন, তার পরের জন করতে করতে এসে থামল রবিনের ওপর। দেখল। গেলা হয়তো যায়, কিন্তু হজম করতে লাগবে কম পক্ষে ছয় হপ্তা। নাহ্, এত ভারি খাবার খেয়ে আরাম নেই। ছোট কিছু দরকার।

বড় বজরা থেকে মৃদু একটা শব্দ আসছে। ফিরে তাকাল বোয়া। মাস্তুলের ওপরে কিকামুর চুল নিয়ে খেলা করছে ময়না।

রবিনকে ডিঙিয়ে এল বোয়া। কিশোর আর মুসার দিকে ফিরেও তাকাল না। খোলা জায়গাটুকু নিঃশব্দে পেরিয়ে এসে উঠল বজরায়।

থেমে দার্শনিককে দেখল। মাংস-টাংস ভালই, পেটও ভরবে, কিন্তু লম্বুর লম্বা লম্বা গুটকো ঠ্যাঙ আর হাড্ডি সর্বস্ব বিশাল ঠোঁটটা নিয়েই ঝামেলা। পালকসহ শরীরটা গিলতে পারলেও পা দুটো বেরিয়ে থাকবে মুখের বাইরে। আর ঠোঁটের মধ্যে না আছে মাংস, না রক্ত, না কোন প্রোটিন। বরং ভেতরে গিয়ে পাকস্থলী ফুটো করে দেয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ধরতে গেলেই ঠোকর খেয়ে শরীর কয়েক জায়গায় ফুটো করে নিতে হবে আগে। থাকগে, কে যায় ঝামেলা করতে।

মাস্তুলের ওপরে রসালো নাস্তার দিকে আবার তাকাল বোয়া।

সাপটাকে ময়নাও দেখেছে। তাড়াহুড়ো করে উঠে গেল মাস্তুলের মাথায়।

মাস্তুলের গা মসৃণ, পিচ্ছিল। কিন্তু বোয়ার নাম খামোকা কনসট্রিকটর রাখা হয়নি, কোন জিনিসকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখায় তার জুড়ি মেলা ভার। মাস্তুল বেয়ে স্বচ্ছন্দে উঠতে শুরু করল সে।

চোখ বড় বড় করে নীরবে চেয়ে রইল ময়না। যেন বোয়ার ঠাণ্ডা শীতল চোখ সম্মোহিত করে ফেলেছে তাকে।

কিকামুর দিকে তাকালও না বোয়া, আলগোছে পেরিয়ে এল। বিরাট হাঁ করে গিলতে এল ময়নাকে।

শেষ মুহূর্তে যেন সংবিত ফিরে পেল ময়না। প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়ে গিয়ে নামল টলডোর ছাতে।

যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভঙ্গিতে আবার নামতে শুরু করল বোয়া। এমন কিছু ঘটতে পারে, জানা ছিল বোধহয়। বাতাসে জোরে জোরে দুলছে এখন কিকামু। নামার পথে তাই অবহেলা করতে পারল না বোয়া, ক্ষণিক থেমে পরীক্ষা করে দেখল খাওয়া চলবে কিনা। চলে, কিন্তু লাভ নেই। শুকনো চামড়া আর চুল খাওয়ার কোন মানে হয় না।

মাস্তুলের গোড়ায় চলে এসেছে বোয়া, এই সময় দরজায় উঁকি দিল নাকু।

সঙ্গে সঙ্গে যেন জমে গেল বোয়া। কাঠে জড়ানো ব্রোঞ্জের একটা মূর্তি যেন।

অভিজ্ঞতা নেই, বিপদ টের পেল না তাপিরশিশু। খিদে পেয়েছে তার, খাবার খুঁজতে এসেছে। গাঁইগুঁই করে মুসাকে ডাকছে। বেরিয়ে এল বাইরে।

দুই ফুটের মধ্যে চলে এল নাকু।

আঘাত হানল বোয়া। তার সিল্কের মত কোমল নরম ঘাড়টা কঠিন লোহার পাইপ হয়ে গেছে নিমেষে। বাঁকা, চোখা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল নাকুর নাক।

ভয়ে, যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল নাকু। জাগিয়ে দিল পাড়ের ঘুমন্ত মানুষগুলোকে।

বন্দুক হাতে দৌড়ে এল কিশোর। কিন্তু সাপটাকে দেখে থেমে গেল, গুলি করা চলবে না। জ্যান্ত ধরতে পারলে দারুণ হবে। দ্বিধায় পড়ে গেল। নাকুকে হারাতেও রাজি নয়।

বোয়ার প্রথম কাজ, ভাইসের মত কঠোর ভাবে শিকারকে কামড়ে ধরা। সেটা ধরেছে। এরপর দ্রুত মাস্তুল থেকে শরীর খুলে এনে পেঁচিয়ে ধরবে। ইতিমধ্যেই খুলতে শুরু করেছে প্যাঁচ। শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিতে শুরু করবে। হাড়মাংস ভর্তা করে পিণ্ড বানিয়ে ফেলবে। তারপর শুরু হবে গেলা। অনেক, অনেক সময় লাগিয়ে গিলবে আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে।

শিকারকে পেঁচিয়ে ফেলার আগেই কিছু করা দরকার। কিন্তু কি করবে? আর কোন উপায় না দেখে বোয়াকে ভয় দেখানোর জন্যে তার মাথার কাছে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করল কিশোর।

'আরে,' না বুঝে বলল মুসা, 'এত কাছে থেকে মিস!'

ইয়া বড় ছুরি হাতে ছুটে এল জিবা।

'না, না,' বাধা দিল কিশোর। 'জ্যান্ত ধরব।' লাফিয়ে নৌকায় উঠে দড়ি আনতে ছুটল।

কিন্তু দড়ি নিয়ে ফিরে এসে দেখল অবস্থা অন্যরকম হয়ে গেছে।

সাপের লেজ গিয়ে বাড়ি লেগেছিল ঘুমন্ত ইগুয়ানার মাথায়। ব্যস, আর যাবে কোথায়। রাগের মাথায় লেজটাই কামড়ে ধরেছে ডাইনোসর। ছাড়ানোর সাধ্য নেই বোয়ার। খালি গড়াগড়ি করছে। তার প্যাঁচের মধ্যে পড়ে বেচারা নাকুর অবস্থা শোচনীয়। বেরোতেও পারছে না, গলা ব্যথা করে ফেলছে চেঁচিয়ে।

কিছু একটা করা দরকার। থামাতে হবে ওগুলোকে। কিভাবে থামাবে, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না কিশোর।

লেজ ছাড়াতে না পেরে বোয়াও গেল খেপে। ডাইনোসরকে আক্রমণ করে বসল।

এ যেন বিউটি আর বীস্টের লড়াই। মাঝখান থেকে নাকুর হয়েছে মহাবিপদ।

কিশোর বুঝতে পারছে, তাড়াতাড়ি কিছু করতে না পারলে অন্তত দুটো জীবকে খোয়াতে হবে। নাকু, এবং দুই দানবের যে কোন একটাকে। দড়ি হাতেই রয়েছে, কিন্তু ফাঁস পরানোর উপায় নেই।

সমস্যার সমাধান করে দিল মুসা। লাফিয়ে গিয়ে পড়ল লড়াইয়ের মাঝে।

টেলিভিশনে দেখেছে, কি করে খালি হাতে বড় অজগর ধরা হয়। সব সাপেরই ঘাড়ের কাছে বিশেষ নার্ভ সেন্টার থাকে, সাপের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা।

দুই হাতে বোয়ার ঘাড় চেপে ধরল সে। বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে টিপে খুঁজতে লাগল নার্ভ সেন্টার।

ঝাড়া মেরে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করল সাপটা। গিয়েওছিল আরেকটু হলেই। কিন্তু হঠাৎ বোধহয় চাপ লাগল নার্ভ সেন্টারে। পলকের জন্যে অবশ হয়ে গেল ওটা। স্থির। এই সুযোগে আরও ভালমত ঘাড় চেপে ধরল মুসা। টেনে সরিয়ে নিয়ে এল ডাইনোসরের কাছ থেকে।

ইনডিয়ানরাও যোগ দিল মুসার সঙ্গে। সাপের বিভিন্ন জায়গা চেপে ধরল ওরা।

ঢিল পেয়ে আরও ভালমত ধরার জন্যে কামড় খুলল ডাইনোসর। কিন্তু আর সুযোগ পেল না। ঝটকা দিয়ে লেজ সরিয়ে নিয়েছে বোয়া।

পাক খুলে যাওয়ায় ইতিমধ্যে নাকুও বেরিয়ে সরে গেছে নিরাপদ জায়গায়। কুঁই কুঁই করছে আর শুঁড় বোলাচ্ছে শরীরের এখানে ওখানে।

এক ইনডিয়ানের গায়ে লেজ দিয়ে সপাসপ বাড়ি মারতে লাগল বোয়া। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

ছুটে গিয়ে লেজ চেপে ধরল রবিন। রাখতে পারল না। টানের চোটে গড়িয়ে পড়ল পাটাতনের ওপর।

মাথাটা ধরে রাখতে পারছে না আর মুসা। ঘাড় ঘুরিয়ে বিশাল হাঁ করে তাকে কামড়াতে চাইছে বোয়া। ঘামে পিচ্ছিল হাত। শত চেষ্টা করেও নার্ভ সেন্টার খুঁজে পাচ্ছে না আর।

শুয়ে থেকেই আবার লেজ চেপে ধরল রবিন। তাকে সাহায্য করতে এগোল কিশোর। হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল লেজের ওপর।

ছেড়ে দেয়ার আগে আরেকবার শেষ চেষ্টা করল মুসা।

অবশ হয়ে গেল আবার বোয়া।

গেছে, পাওয়া গেছে! আনন্দে আরও জোরে টিপে ধরল মুসা।

পাটাতনে ফেলে সাপটাকে চেপে ধরল সবাই। ঠিক কোন জায়গায় চাপ দিতে হয়, জেনে গেছে মুসা। আঙুলের চাপ সরাচ্ছে না।

'ধরলাম তো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'রাখি কই?'

আঙুল তুলে মনট্যারিয়ার টনডো দেখাল জিবা।

তা-ই করা হলো। সাপটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে টনডোতে ভরে দরজা আটকে দেয়া হলো।

'হ্যাঁ, বেশ ভাল জায়গা পেয়েছে,' বলল কিশোর।

বড় বজরার পাটাতনে, টনডোর ছাতে জিরাতে বসল সবাই। একটিমাত্র সাপ ঘাম ঝরিয়ে ছেড়েছে এতগুলো লোকের।

'আরিব্বাপরে, এত শক্তি!' ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে মুসা।

'টলডোর বেড়া ভেঙে না পালায়।'

'না, তা বোধহয় করবে না,' রবিন বলল। 'পানিকে ভয় পায়। তবে বলাও যায় না। শান্ত করে ফেলা দরকার।'

'শান্ত?' মুখ তুলল মুসা। 'কিভাবে?'

'পেটে খিদে ওটার,' জবাব দিল কিশোর। 'পেট ভরাতে হবে। তাহলেই দিন কয়েকের জন্যে চুপ।'

বোয়ার খাবারের সমস্যা নেই। বুনো জানোয়ার চলাচলের পথে মাটিতে গর্ত করে ফাঁদ পেতে রেখেছেই একটা অল্প বয়েসী পেকারি ধরে নিয়ে এল ইনডিয়ানরা। টলডোর দরজা খুলে জানোয়ারটাকে ভেতরে ঠেলে দিয়েই আবার বন্ধ করে দিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল পেকারির আতঙ্কিত আর্তনাদ। দ্রুত কমে এল চিৎকার, তারপর চাপা গোঙানি, অবশেষে তা-ও বন্ধ হয়ে গেল।

টলডোর দরজা খুলে সাবধানে উঁকি দিল মিরাটো। এক নজর দেখে ইশারায় ডাকল কিশোরকে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

বোয়ার বিশাল হাঁয়ের ভেতরে অর্ধেক ঢুকে গেছে পেকারি।

'খাইছে!' মুসা অবাক। 'এত বড়টা ঢোকাল কিভাবে?'

'চোয়ালের গোড়া আলাদা। ওদের,' বোঝাল কিশোর। 'আমাদের চোয়ালের মত নয়। ওপরের আর নিচের চোয়ালের মাঝে ইলাসটিকের মত জিনিস রয়েছে, ইচ্ছে করলেই অনেক বেশি ছড়াতে পারে চোয়াল।'

দেখতে দেখতে পেকারিটাকে গিলে ফেলল বোয়া।

'মারছে!' মাথা নাড়ল মুসা। 'এই রাক্ষসের জন্যে রোজ খাবার জোগাড় করবে কে?'

'ভয় নেই, রোজ লাগে না,' রবিন বলল। 'ওই এক পেকারিতেই ওর এক হপ্তা চলে যাবে। দুই হপ্তাও যেতে পারে। ওর রাগ-টাগ সব শেষ। চুপচাপ গিয়ে এখন অন্ধকার কোণে শুয়ে পড়বে। নাড়া দিলেও আর কিছু করবে না। পড়ে পড়ে ঘুমাবে। খিদে পেলে তারপর জাগবে।'

ঠিকই বলেছে রবিন।

খাওয়া শেষ হতেই টলডোর কোণের দিকে রওনা হলো বোয়া। সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে নিয়ে কুণ্ডলী পাকাল। মাথাটা কুণ্ডলীর ওপরে রেখে চুপ হয়ে গেল। আবছা অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে, বেমক্কাভাবে ফোলা হয়ে ফুলে থাকা পেটটা, ওখানেই রয়েছে পেকারি।

পরের সারাদিন বোয়ার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

এই সময়ে আরেক কাণ্ড হয়েছে। বনের ভেতরে শিকারের খোঁজে গিয়েছিল মিরাটো আর দুজন ইনডিয়ান। ঝুড়িতে ভরে নিয়ে এসেছে আরও ডজনখানেক সাপের বাচ্চা। একটা বোয়ার বাসা পেয়ে গিয়েছিল, তাতেই ছিল বাচ্চাগুলো।

খুশি হলো কিশোর। বোয়ার বাচ্চারও নেহায়েত কম চাহিদা নয়। বারোটা

বাচ্চার অনেক দাম।

অন্ধকার থাকতেই রওনা হলো বজরা-বহর।

মাঝরাতের দিকে অনুকূল হাওয়া পেয়ে পাল তোলা হলো। আশপাশের জঙ্গল নীরব। সরু একটা প্রণালীর ভেতর দিয়ে চলেছে এখন তিনটে নৌকা। এক পাশে মূল ভূখণ্ড, আরেক পাশে ছোট একটা দ্বীপ।

হঠাৎ সামনের আবছা অন্ধকারের চাদর ফুঁড়ে বেরোল যেন নৌকাটা, একটা ক্যানু। পর্তুগীজ ভাষায় চিৎকার শোনা গেল, মনে হলো সাহায্যের আবেদন। সন্দেহ হলো কিশোরের—ফাঁদ নয়তো? কিন্তু সত্যি যদি বিপদে পড়ে থাকে লোকটা? পাল নামানোর নির্দেশ দিল সে।

ক্যানুর পাশাপাশি হলো বড় বজরা।

'কিশোর পাশাআ (পাশা)?' ক্যানু থেকে বলল একটা কণ্ঠ।

'হ্যাঁ,' সন্দেহ বাড়ল কিশোরের। নাম জানল কিভাবে? ক্যানুতে মাত্র দু-জন লোক

'ওরাই!' অদৃশ্য কারও উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল ক্যানুর একজন।

তীরের কাছে অন্ধকার থেকে সাড়া এল। পানিতে একসাথে অনেক দাঁড় ফেলার ছপছপ শব্দ।

'পাল!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'জলদি!'

কিন্তু পালের দড়িতে হাত দেয়ার আগেই ক্যানুর একজন ঝুঁকে বড় বজরার কিনারা আঁকড়ে ধরল। হাতের রিভলভার নেড়ে বলল, 'খবরদার! নড়লেই মরবে!'

পাথর হয়ে গেল যেন ইনডিয়ানরা।

সাপের ঝুড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসা। জায়গাটা অন্ধকার। তাকে দেখা যাচ্ছে না।

এগিয়ে আসছে দাঁড়ের শব্দ। যা করার এখুনি করতে হবে। আস্তে ঝুঁকে সাপের বাচ্চা ভরা ঝুড়িটা তুলে নিল সে।

নৌকাটা আবছা দেখা যাচ্ছে এখন। বেশ বড়। তাতে অনেক লোক। নিশ্চয় ভ্যাম্প আর তার দলবল।

আর দেরি করল না মুসা। দু-হাতে ধরে ঝুড়িটা মাথার ওপরে তুলে ছুঁড়ে মারল ক্যানুর দু-জনকে লক্ষ্য করে।

তিন

ঝুড়ির মুখ খুলে গিয়ে মাথার ওপর যেন সর্পবৃষ্টি হলো।

কি সাপ, বিষাক্ত কিনা, কি করে জানবে ওরা? মাথা ঢাকার জন্যে হাত উঠে গেল ওদের। ট্রিগারে আঙুলের চাপ লেগে গুলি ফুটল। কিন্তু কারও কোন ক্ষতি করল না বুলেট, আকাশমুখো উড়ে গেল। আতঙ্কে চেঁচাচ্ছে ক্যানুতে বসা

...থাবা দিয়ে গা থেকে সরাচ্ছে কিলবিলে জীবগুলোকে।

বড় বজরার কিনার থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে অন্যজন। হাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল পানিতে, কাত করে ফেলল ক্যানু। অন্য লোকটাও পানিতে পড়ল।

'বাঁ-বাঁচাও!' হাত ছুঁড়ছে একজন। 'আ-আমি···সাঁতার জানি না···গ্লুপ!'

কেউ বাঁচাতে গেল না তাকে। পালের দড়ি বাঁধা হয়ে গেছে বজরা-বহরের। ঝপাত করে পানিতে পড়ল দাঁড়। উল্টানো ক্যানুটার পাশ দিয়ে ধেয়ে বেরোল নৌকা।

পেছনে বড় নৌকাটায় চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। স্প্যানিশ আর পর্তুগীজ শব্দ কম, বেশির ভাগই অশুদ্ধ ইংরেজি। ডাকাতগুলোকে বোধহয় ইকিটোজ থেকেই জোগাড় করেছে ভাম্প। তাদের মাঝে একজন কি দু-জন রয়েছে ইনডিয়ান কিংবা ক্যাবোকো, যে নদীপথ চেনে। বাকিগুলো সব আনাড়ি। দক্ষ জাহাজী হতে পারে। কিন্তু নদীপথে দাঁড় বেয়ে নৌকা চালানো এক কথা, আর সাগরে এঞ্জিনের জাহাজ চালানো আরেক।

বোঝা যাচ্ছে দাঁড় বাওয়া দেখেই। মনটারিয়া নিয়ে ধাওয়া করেছে। দুই ধারে চারজন করে দাঁড়ি। বেশি ভিড় বলা যাবে না। কিন্তু এতেই গোলমাল করছে ওরা, দাঁড়ে দাঁড়ে লাগিয়ে দিচ্ছে, ফলে ব্যাহত হচ্ছে নৌকা বাওয়া। একে অন্যকে দোষ দিচ্ছে, গালাগাল করছে মুখ খারাপ করে।

পানিতে পড়া দু-জনকে তোলার জন্যে থামতে হলো ভাম্পকে। ক্যানুটা সোজা করে বাঁধল মনট্যারিয়ার সঙ্গে। সময় নষ্ট হলো তাতে।

'থাংকিউ, মুসা,' এতক্ষণে বলল কিশোর।

মুসা বুদ্ধি করে সাপের ঝুড়ি ছুঁড়ে মারাতেই বেঁচেছে ওরা। কিন্তু স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকল না। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুটে এল মনটারিয়া থেকে। প্রচণ্ড রাগে যেন এলোপাতাড়ি ছুঁড়তে লাগল। শক্তিশালী রাইফেল, শব্দ শুনেই বোঝা যায়। পাঁচশো ফুট দূরত্ব কিছুই না ওগুলোর জন্যে।

বড় বজরার গলুইয়ের কাছে কাঠের চলটা ওঠাল একটা বুলেট, টলডোর ছাত ফুঁড়ে গেল একটা, আরেকটা এসে ভেঙে দিল মঞ্চের এক পা। বেকায়দা ভঙ্গিতে সামান্য কাত হয়ে গেল মঞ্চটা। হাল ছেড়ে লাফ দিয়ে নেমে এল জিবা।

শাঁই করে নাক ঘুরে গেল বড় বজরার।

ধমক দিয়েও জিবাকে আর পাঠানো গেল না মঞ্চে।

তোতলাচ্ছে জিবা, কি বলল বোঝা গেল না। নাকমুখ গুঁজে গিয়ে টলডোর ভেতরে পড়ল।

দাঁড় ফেলে লাফিয়ে গিয়ে টলডোতে উঠল মুসা। ছুটে গিয়ে চড়ল মঞ্চে। হাল ধরে নৌকার মুখ সোজা করল আবার। কিন্তু ইতিমধ্যে মহামূল্যবান খানিকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

তার চারপাশে বুলেট ছুটছে। আকাশ আর তারার পটভূমিকায় বেশ স্পষ্ট নিশানা এখন সে। যে কোন মুহূর্তে এসে পিঠে বিঁধতে পারে গুলি। কিন্তু পরোয়া করল না। হাল ধরে না রাখলে বজরা-বহরের সবাইকে মরতে হবে। এখন তাকে দেখলে কে বলবে এই সেই ভূতের ভয়ে-কাবু 'স্বভাবভীরু' মুসা আমান!

'কিশোর!' চেঁচিয়ে বলল মুসা, 'ক্যানুর দড়ি কাটতে বলো।'

'কেন...' বলেই থেমে গেল কিশোর। বুঝতে পেরেছে।

মিরোটাও পেরেছে। ছুরি হাতে ছুটে গেল সে।

সরু খালে পঁচিশ ফুট লম্বা ক্যানু আড়াআড়ি পড়ে থাকলে ওটা না সরিয়ে কোন নৌকা এগোতে পারবে না।

দড়ি ধরে টেনে ক্যানুটাকে কাছে নিয়ে এল মিরাটো। কয়েক পোঁচেই দড়ি কেটে ফেলল। ক্যানুর গলুই ধরে ধাক্কা লাগাল জোরে। আধ চক্কর ঘুরে আড়াআড়ি হয়ে গেল ক্যানু। ভাসতে লাগল খাল জুড়ে।

'মিনিটখানেক দেরি করাবে,' বিড়বিড় করল মুসা।

তার কথার জবাবেই যেন ছুটে এল বুলেট। প্যান্টের হাঁটুর ওপরে কাপড়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল উরু। মনে মনে বলল, 'আল্লা, ক্যানুটা যেন না দেখে।'

সময়মত চোখে না পড়লে জোরে এসে তাতে ধাক্কা খাবে মনটারিয়ার গলুই, ভেঙে যাওয়ার ষোলো আনা সম্ভাবনা।

সময়মতই দেখল ভ্যাম্প, কিন্তু বেশি মাতব্বরী করতে গিয়ে পড়ল বিপাকে। সময় নষ্ট হবে, তাই ক্যানু না সরিয়ে ওটার এক গলুই ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল। আসতে পারত, যদি মাল্লারা আনাড়ি না হত।

বুনো চিৎকার করে উঠল নৌকা বোঝাই ডাকাতেরা। তাদের চিৎকার ছাপিয়ে শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠ, পর্তুগীজ ভাষায় হুঁশিয়ার করছে। বোধহয় ইনডিয়ান, যে এই এলাকা চেনে। পানিতে দাঁড়ের খোঁচা মেরে মনটারিয়াকে সরানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল ওরা। পারল না। বালির চরায় নৌকার তলা ঘষা খাওয়ার তীক্ষ্ণ খচখচ শব্দ দূর থেকেও শোনা গেল। কাত হয়ে গেল নৌকা। পালের জন্যে আরও বেশি কাত হয়ে পানিতে ডুবে গেল একটা পাশ। মাল্লাদের কিছু চরায় ছিটকে পড়ল, কিছু পানিতে।

'জোরে!' মঞ্চ থেকে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'জোরে টানো দাঁড়। পালানোর এই সুযোগ।'

গুলি বন্ধ হয়েছে দেখে আবার গিয়ে হাল ধরল জিবা।

অন্ধকারে আঁকাবাঁকা খাল ধরে তীব্র গতিতে ধেয়ে চলল বজরা-বহর। ধীরে ধীরে পেছনে পড়ল ডাকাতদের উত্তেজিত চেঁচামেচি, একটা সময় আর শোনা গেল না।

হাঁপ ছাড়ল নৌকার সবাই।

কিন্তু এই অবস্থা বেশিক্ষণ থাকবে না, জানে কিশোর। নৌকা সোজা করে নিয়ে খানিক পরেই আবার ছুটে আসবে জ্যাম্পের দল। যত খারাপ মাল্লাই হোক, ওরা সংখ্যায় বেশি। তাছাড়া মনট্যারিয়া হালকা নৌকা। ভারি বাটালাওয়ের চেয়ে দ্রুতগতি। তার ওপর ব্যাটালাও একা চলছে না, টেনে নিতে হচ্ছে আরেকটা নৌকাকে। বোঝা তো আছেই।

কাজেই, জ্যাম্পের নৌকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বজরা-বহরের পারার কথা নয়।

পালের ওপর বিশেষ ভরসা নেই। অনুকূল হাওয়া না থাকলে পাল অকেজো। আর খালি যদি সামনে ছোটার ব্যাপার হত, এক কথা ছিল। পথে পথে থামতে হবে তাদেরকে, জানোয়ার ধরার জন্যে। ধরতেই যদি না পারল, এই অভিযানই বৃথা।

যা উঁচু মাস্তুল, লুকাবে কোথায় নৌকাদুটোকে?

খাল দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার চওড়া নদীতে পড়ল বজরা-বহর। প্রায় পাঁচ মাইল চওড়া এখানে নদী। সামনে আরও চওড়া হয়েছে। যেন অকূল পাথার। মাঝে একটা দ্বীপও আর চোখে পড়ছে না। দিনের বেলা এই খোলা নদীতে রাইফেলের সহজ নিশানায় পরিণত হবে ওরা।

উষার আগমন ঘোষণা শুরু করল পাশের জঙ্গলের পশু পাখি। পুব আকাশে মলিন হয়ে এল তারার আলো। ধূসর, ঠাণ্ডা আলো ফুটতে শুরু করেছে দিগন্তরেখা বরাবর। তার খানিক ওপরে মেঘের গায়ে রঙের ছোঁয়া লাগল, গাঢ় থেকে গাঢ়তর হলো লাল, তারপর হঠাৎ করে যেন ঝাঁপি খুলে লাফিয়ে বেরিয়ে এল টকটকে লাল সূর্য।

বজরা-বহরের পেছনে দূরে কালো একটা বিন্দু দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় জ্যাম্পের মনট্যারিয়া। ওটা যখন এরা দেখতে পাচ্ছে, ওদের জন্যে বজরা-বহর দেখতে পাওয়াটা আরও সহজ।

চওড়া হওয়া যেন শেষ হবে না নদীর। এখনই এক তীর থেকে আরেক তীর দশ মাইল হয়ে গেছে।

ম্যাপ দেখল কিশোর। সামনে এক গুচ্ছ দ্বীপ থাকার কথা, তার পরে আবার খোলা নদী। এক জায়গায় নীল মোটা একটা রেখা মূল ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে। নদী একখান থেকে ঢুকেছে ডাঙার ভেতরে, আরেকখান দিয়ে বেরিয়ে আবার পড়েছে নদীতে।

ওখানে কি আছে জিবাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কিছু নেই,' মাথা নাড়ল জিবা। 'তোমার ম্যাপ ভুল। থাকলে, জানতাম।'

'কিন্তু এই ম্যাপ ভুল হতে পারে না,' তর্ক করল কিশোর। 'আমেরিকান জিওগ্রাফিক্যাল...'

বুঝতে চাইল না জিবা। তার এক কথা, ম্যাপ ভুল।

কিন্তু শেষে দেখা গেল, জিবাই ভুল করেছে। চওড়া খালটা পাওয়া গেল। কিশোরের নির্দেশে তাতে ঢুকে পড়ল বজরা-বহর। দুই ধারে জঙ্গল এত ঘন,

ড্যাম্পের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে, যদি না তার কাছেও এ-রকম একটা ম্যাপ থেকে থাকে।

পানির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠেছে বড় বড় গাছ। খাড়া উঠে গেছে দু-শো ফুট। তারপর দু-দিক থেকে এসে মিশেছে দু-দিকের ডালপালা, মাথার ওপরে ছাত তৈরি করে নিয়েছে। সেই ছাতকে জীবন্ত করে রেখেছে বানরের দল আর রাশি রাশি পাখি—চোখ ধাঁধানো রঙ।

বাতাস নেই এখানে। পাল তুলে রাখার আর কোন মানে হয় না। নামিয়ে ফেলা হলো। পানিতে ঢেউও নেই, কাচের মত স্বচ্ছ। দাঁড় বাওয়া সহজ।

এগিয়ে চলেছে বজরা বহর, ভেসে থাকা কুমিরের নাকে ঢেউ লাগছে, বিচিত্র শব্দ করে তলিয়ে যাচ্ছে ওগুলো। এক জায়গায় ধ্যানমগ্ন হয়ে ছিল দুটো জ্যাবিরু সারস, নৌকা দেখে ধ্যান ভাঙল। এক পায়ের জায়গায় দুই পা দেখা দিল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের সঙ্গে কথা বিনিময় হলো নকুর।

'আরি! দেখো দেখো!' আঙুল তুলে দেখাল মুনা। 'পানির ওপর দৌড়াচ্ছে গিরগিটি।'

দাঁড় বাওয়া থামিয়ে অদ্ভুত জীবটাকে দেখল সবাই। লেজসহ ফুট তিনেক লম্বা। পেছনের দুই পা আর লেজের ওপর ভর, সামনের দুই পা তুলে রেখেছে অনেকটা মোনাজাতের ভঙ্গিতে।

'ব্যাসিলিস্ক,' বলল কিশোর।

'অনেক দাম,' রবিন বলল। 'ধরতে পারলে কাজ হয়।'

কিন্তু ধরা কঠিন। পানির ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে একপাড় থেকে আরেক পাড়ে, আবার আসছে এ-পাড়ে, খাবার খুঁজছে। আসছে-যাচ্ছে নৌকার সামনে দিয়েই। কারও দিকে খেয়াল নেই, নিজের কাজে ব্যস্ত।

আরেকবার নৌকার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ঝাঁপ দিল মিরাটো। পড়ল গিরগিটিটার ওপর। তলিয়ে গেল। খানিক পরে আবার যখন ভেসে উঠল, দেখা গেল তার হাতে ছটফট করছে ব্যাসিলিস্ক।

গলায় দড়ি লাগিয়ে বড় বজরার টিনভোর ভেতরে একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখা হলো জীবটাকে। বাঁধা না থাকলে ঝামেলা করে, তাই মোট চারটে জীবকে বেঁধে রাখা হয়েছে এখন। নকুর ঠ্যাঙ-এ শুরু থেকেই দড়ি ছিল, বোয়ার সঙ্গে গোলমাল করার পর নাকু আর ডাইনোসরের গলায়ও দড়ি পড়েছে।

খালটা আট মাইল লম্বা। শেষ হলো একটা মোহনায়—ন্যাপো আর আমাজনের মিলনস্থল।

ড্যাম্প পিছে পিছে খাল ধরে আসছে কিনা, জানে না কিশোর। সরাসরি আমাজন ধরে আর যেতে চাইল না। তার চেয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে ঢুকে যাবে ন্যাপো নদীতে। খোলা আমাজন ধরে গেলে ডাকাতদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা বেশি।

নদীটার বড় একটা বাঁক ঘুরতেই গাছপালা আড়াল করে ফেলল বজরা-বহরকে। আমাজন থেকে আর দেখা যাবে না।

আরও খানিক দূর এগিয়ে শান্ত একটা বাঁকের কাছে নৌকা বাঁধার নির্দেশ দিল কিশোর। দিনটা ওখানেই কাটাবে।

তীর ঘেঁষে নৌকা রাখলে বোয়া নেমে যেতে পারে, তাই রাখা হলো বিশ ফুট দূরে। কিন্তু এত দূরেও গভীরতা বড়ই কম, মাত্র হাঁটু পানি ওখানে। নিচে নরম বালি। কাদা নেই। পানি ভেঙে সহজেই হেঁটে গিয়ে ওঠা যাবে ডাঙায়।

আগে নামল মুসা। ডাঙায় উঠল। এবং উঠেই জড়াল গোলমালে।

চার

হাঁ হয়ে গেছে মুসা। চোখ ডলল। বিশ্বাস করতে পারছে না, এ-রকম জীব আছে দুনিয়ায়, ওই চেহারার!

ভালুকের মত পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। শরীরটাও গলা পর্যন্ত ভালুকের মত। কিন্তু গলার ওপরে···কিসের সঙ্গে তুলনা করবে? শুঁড়? না। নাক? তা-ও না। মাথা নেই, মুখ নেই, চোয়াল নেই। মোটা একটা নল যেন ঘাড়ের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে, আগাটা সরু, তাতে গোল ছিদ্র। সেটা দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে বেরোচ্ছে লকলকে···হ্যাঁ, বোধহয় জিভই।

পেশীবহুল বিশাল দুই শক্তিশালী বাহু, থাবা কিংবা আঙুল নেই, তার জায়গায় রয়েছে ইঞ্চি চারেক লম্বা বাঁকা নখ। ওই নখ দিয়ে মানুষের সমান উঁচু, কঠিন উইয়ের ঢিবি এত সহজে চিরছে, যেন ছুরি দিয়ে মাখন কাটছে। পিলপিল করে বেরোচ্ছে উই। দুই ফুট লম্বা, লাল, সাপের জিভের মত জিভে আটকে পোকাগুলোকে নলের ভেতরে চালান করছে জীবটা। নাক-মুখ দুয়েরই কাজ করে তার নল।

মুসার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'জায়ান্ট অ্যান্টইটার!' ফিসফিসিয়ে বলল। 'ধরতে পারলে কাজ হয়।'

'পিঁপড়েখেকো এত বড় হয়!'

'হয়,' পেছন থেকে বলল রবিন। 'অনেক জাতের পিঁপড়েখেকো আছে। এটা সবচেয়ে বড় জাতের। অ্যান্টবিয়ারও বলে একে।'

'সেটাই ঠিক নাম। ভালুকের মতই। তো, ধরতে বলছ? বেশ, ধরে দিচ্ছি।' এমন ভঙ্গি করল মুসা, যেন খোঁয়াড় থেকে মুরগী ধরে আনতে যাচ্ছে।

'সাবধান!' কিশোর বলল। 'ডেনজারাস।'

'ডেনজারাস? কিভাবে? দাঁতই নেই···'

'নখ আছে।'

'পেছন থেকে ধরব,' সাপটাকে ধরে সাহস বেড়ে গেছে মুসার। নিজেকে টারজান ভাবতে আরম্ভ করেছে।

পিঁপড়েখেকোর দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ, গন্ধেই আঁচ করে নিল ব্যাপার সুবিধের নয়। সামনের দুই পা নামিয়ে পিছু হটতে শুরু করল। পেছনে দুলছে অদ্ভুত লেজটা। এমন লেজ থাকতে পারে কোন জানোয়ারের, কল্পনাও করেনি কোন দিন মুসা। কয়েক ফুট লম্বা একটা ব্রাশ যেন, ব্রাশের রোঁয়াগুলো প্রায় দুই ফুট লম্বা। নাকের মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত জীবটা লম্বায় ফুট সাতেক।

পা টিপে টিপে পিঁপড়েখেকোর পেছনে চলে এল মুসা। পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু-হাতে পেট জড়িয়ে ধরল। দমে গেল শুরুতেই। অসাধারণ জোর জানোয়ারটার গায়ে। ঝাড়া দিয়ে পিঠ থেকে ফেলে দিল তাকে। নখের সামান্য ছোঁয়া লাগল শুধু গোয়েন্দা-সহকারীর বাহুতে, তাতেই গভীর আঁচড় পড়ল চামড়ায়, রক্ত দেখা দিল।

আবার দু-পায়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল পিঁপড়েখেকো। লম্বা জিভটা নলের ভেতর ঢুকছে-বেরোচ্ছে।

পিছু হটতে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা একটা মরা ডালে হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ে গেল মুসা। চোখের পলকে তার গায়ের ওপর এসে পড়ল রোমশ দানবটা। দুই বাহু বাড়িয়ে দিল জড়িয়ে ধরার জন্যে।

প্রমাদ গুণল কিশোর। শুনেছে, ওভাবে ধরে চাপ দিয়ে পুমার পাঁজরও গুঁড়িয়ে দেয় পিঁপড়েখেকো।

ধরা পড়ার আগেই গড়িয়ে সরে এল মুসা, উঠে দাঁড়াল। একপাশ থেকে চেপে ধরল লম্বা নলটা।

হ্যাঁচকা টানে নল ছুটিয়ে নিল পিঁপড়েখেকো। বাইসাইকেলের প্যাডাল ঘোরানোর মত করে দুই বাহু চালাল। ভয়াবহ নখ দিয়ে চিরে দিতে চায় আক্রমণকারীকে।

জানোয়ারটার দুর্বল জায়গা কোথায়, বুঝে ফেলেছে মুসা। পাশ থেকে লাফিয়ে এসে আবার চেপে ধরল লম্বা নল। মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে মাটিতে ফেলে দেবে কোরবানীর গরুর মত, তারপর পিঠে চেপে বসে কাবু করবে।

হঠাৎ পাশের ঝোপ সরিয়ে বেরিয়ে এল আরেকটা পিঁপড়েখেকো। প্রথমটার চেয়ে বড়, বোধহয় মদ্দা।

হতভম্ব হয়ে গেল মুসা, কিন্তু নল ছাড়ল না।

রবিন বোবা।

ঝট করে ঘুরে দৌড় দিল কিশোর, নৌকা থেকে বন্দুক আনার জন্যে।

বিচিত্র আওয়াজ করে সঙ্গিনীকে সাহায্য করতে ছুটে এল পুরুষ জানোয়ারটা।

বিদ্যুত খেলে গেল যেন মিরাটোর শরীরে। লাফিয়ে এসে পড়ল পিঁপড়েখেকোর সামনে। শাই করে হাতের ছুরি চালাল। ছুরি না বলে তলোয়ার বলাই ভাল ওটাকে, তিরিশ ইঞ্চি লম্বা ফলা।

সোজা হয়ে দাঁড়াল পিঁপড়েখেকো—পুরো ছয় ফুট, মিরাটোর চেয়ে পাঁচ ইঞ্চি

উঁচু। থাবা চালাতে শুরু করল। মিরাটোর হাতে একটা ছুরি, কিন্তু ওটার দুই হাতে তিন-দু-গুণে ছয়টা। চার ইঞ্চি করে লম্বা, বাঁকা, ক্ষুরের মত ধার। ইস্পাতের চেয়ে শক্ত।

খুব সতর্ক মিরাটো, ক্ষিপ্র। লাফ দিয়ে দিয়ে সরে যাচ্ছে, একই সাথে ছুরি চালাচ্ছে শাঁই শাঁই করে। কিন্তু লাগাতে পারছে না। আরও কাছে থেকে কোপাতে হবে।

কাছে এসেই নখের আওতায় পড়ে গেল মিরাটো। তার নগ্ন বুক চিরে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত।

লাফিয়ে ডানে সরে গেল সে। সামান্য সামনে ঝুঁকেছে পিঁপড়েখেকো। সোজা হওয়ার সুযোগ না দিয়েই ছুরি চালাল মিরাটো। এক কোপে ঘাড় থেকে আলাদা করে ফেলল লম্বা নল। কাটা গলা দিয়ে পিচকারির মত ছিটকে বেরোল রক্ত। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল বিশাল ধড়টা।

বোতল আনতে নৌকায় ছুটল একজন ইনডিয়ান। রক্তচাটাকে খাওয়ানোর জন্যে রক্ত জমিয়ে রাখবে।

ওদিকে জমে উঠেছে মুসা আর মাদী-পিঁপড়েখেকোর লড়াই। অন্য কোনদিকে নজর দিতে পারছে না। নল চেপে ধরে মোচড় দিয়ে বার বার ফেলে দিচ্ছে মুসা, কিন্তু রাখতে পারছে না, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে জানোয়ারটা।

না, এভাবে হবে না। মুসার ধারণা, জীবটা সাঁতার জানে না। নল চেপে ধরে তাই ঠেলে নিয়ে চলল পানির দিকে। ইচ্ছে, চুবিয়ে কাবু করবে।

সাহায্য করতে এগোল মিরাটো। কিন্তু সে কিছু করার আগেই পিঁপড়েখেকোকে নিয়ে পানিতে পড়ল মুসা। ভুল যে করেছে, বুঝতে পারল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দক্ষ সাঁতারু পিঁপড়েখেকো। জোর কমল না, দাপাদাপি বাড়িয়ে দিল আরও।

একটাই উপায় আছে এখন। নলের মুখ পানিতে ডুবিয়ে ধরা। শ্বাস নিতে না পারলে কাহিল হবেই জানোয়ারটা।

সেই চেষ্টাই করল মুসা। কিন্তু কপাল খারাপ তার। পা পিছলে ঝপাং করে পড়ল।

সুযোগ ছাড়ল না পিঁপড়েখেকো। জড়িয়ে ধরল শত্রুকে। একটু আগে তার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহারটা করা হচ্ছিল সেটা ফিরিয়ে দিতে চাইল। দু-পেয়ের কাছে শেখা পদ্ধতিতেই তাকে পানির তলায় চেপে ধরে কাহিল করতে চাইল।

হাত থেকে নল ছুটে গিয়েছিল, থাবা দিয়ে আবার চেপে ধরল মুসা। প্রাণপণ চেষ্টায় টেনে নামাল পানির তলায়। শ্বাসরুদ্ধ করে দিল।

দুজনেরই নাক এখন পানির তলায়। যে বেশিক্ষণ দম রাখতে পারবে, সে-ই জিতবে।

সাঁতারু, বিশেষ করে ডুবসাঁতারে মুসার চেয়ে দুর্বল পিঁপড়েখেকো, সুতরাং আগেই দম ফুরাল। মরিয়া হয়ে নাক তোলার চেষ্টা করতে লাগল সে। ঢিল হয়ে

গেল বাহুর বাঁধন, বাঁচার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এখন জানোয়ারটা। দম ধরে রেখেই তার নিচ থেকে সরে এল মুসা, মাথা তুলল পানির ওপর।

দাপাদাপি কমে গেল পিঁপড়েখেকোর, ছটফট করছে শুধু এখন।

ইনডিয়ানরা সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

ধরে ফেলা হলো পিঁপড়েখেকোকে। বেঁধে এনে তোলা হলো বড় বজরায়।

বানির চরায় চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে মুসা। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে মলম আর আয়োডিন নিয়ে এল রবিন। মুসার ক্ষতগুলো পরিষ্কার করতে বসল।

'দারুণ দেখিয়েছ হে, সেকেণ্ড,' হেসে বলল কিশোর। 'স্কুলে গিয়ে বললে বিশ্বাসই করবে না কেউ।'

প্রশংসায় খুশি হলো মুসা। 'ধরতে বলেছ, ধরে দিয়েছি, আমি আর কিছু জানি না। খাওয়ানোর দায়িত্ব তোমাদের। ওর জন্যে রোজ চার-পাঁচ কেজি পিঁপড়ে জোগাড় করবে কে?'

'পিঁপড়ে লাগবে না,' হাত নাড়ল কিশোর। 'চিড়িয়াখানায় মাংসের কিমার সঙ্গে কাঁচা ডিম মেখে খাওয়ায়। তা-ই খাওয়াব।'

'রাখবে কোথায়?'

'বজরাতেই। শান্ত স্বভাবের জানোয়ার। দুর্ব্যবহার না করলে রাগে না। দু-দিনেই পোষ মেনে যাবে।'

মরা জানোয়ারটাকে কেটে রান্না করল ইনডিয়ানরা।

কিশোর এক টুকরো মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দিল।

মুখে দিয়ে মুখ বাঁকা করে ফেলল মুসা। 'এহহে, একেবারে সিরকা। এর চেয়ে কাঁচা পিঁপড়ে খাওয়া সহজ।'

রবিন মুখেই দিল না।

ইনডিয়ানরা খেলো। পিঁপড়েখেকোর মাংস নাকি রোগ সারায়।

পাঁচ

'আগুন! আগুন!' বনের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

আমাজনের কিনার দিয়ে চলেছে আবার বজরা-বহর।

'ইনডিয়ানদের গাঁ জ্বলছে,' অনুমানে বলল রবিন।

'না,' মাথা নাড়ল জিবা। 'বিদেশীর-ঘর, রিও থেকে এসেছে। ফার্ম করেছে ওখানে। বোধহয় ইনডিয়ানরা জ্বালিয়েছে।'

'এই, নৌকার মুখ ঘোরাও,' নির্দেশ দিল কিশোর।

হাল ঘোরাল না জিবা। 'ইনডিয়ানরা যদি থাকে? ধরে কেটে ফেলবে।'

'জলদি ঘোরাও,' জিবার কথা কানেই তুলল না কিশোর। 'আগুন নেভাতে হবে। জলদি।'

কথা শুনল না জিবা। আগের মতই হাল ধরে রইল।

মঞ্চে উঠে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে হাল ধরল মুসা। ঘুরিয়ে দিল নৌকার গলুই।

বিড়বিড় করতে করতে মঞ্চ থেকে নেমে এল জিবা।

তীর থেকে কয়েক ফুট দূরে নোঙর ফেলা হলো। মাটিতে গলুই ঠেকিয়ে রাখলে বন্দিরা পালাতে পারে, সে-জন্যে এই সতর্কতা।

তীরে নামল সবাই। কিশোর আর রবিনের হাতে বন্দুক, মুসার হাতে রাইফেল। ইনডিয়ানদের হাতে তীর-ধনুক, ব্লো-গান আর বল্লম। জিবার হাতে বিশাল এক ছুরি।

চলার সময় খালি পেছনে পড়ছে সে। নৌকার দড়ি কেটে নৌকা নিয়ে পালানোর মতলব আঁটছে বোধহয়। সতর্ক রয়েছে কিশোর। লোকটাকে চোখের আড়াল করল না।

কিন্তু দেরি করিয়ে দিচ্ছে জিবা। শেষে বিরক্ত হয়ে তাকে সবার সামনে ঠেলে দিল কিশোর। 'তুমি আগে থাকো। জোরে হাঁটো।'

গোঁ গোঁ করে প্রতিবাদ জানাল জিবা। কিন্তু কান দিল না কিশোর।

খানিক দূর এগোতেই আগুন আরও ভালমত দেখা গেল। বালতি নিয়ে ছোটাছুটি করছে একজন লোক, কুয়া থেকে পানি এনে আগুনে ছিটাচ্ছে। কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

জিবার পিঠে বন্দুকের নল দিয়ে খোঁচা মেরে বলল কিশোর, 'দৌড় দাও।'

দৌড়ে এগোল সবাই।

একদল সশস্ত্র লোক দেখে চমকে কোমরের কাছে হাত দিল তরুণ লোকটা, হতাশ হলো। রিভলভার থাকার কথা, কিন্তু নেই।

'বালতি-টালতি আর আছে?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ভয় চলে গেল লোকটার চেহারা থেকে। ইংরেজিতেই জবাব দিল, 'ওই যে, ওখানে আছে।' একটা চালাঘর দেখাল।

যে যা পারল—বালতি, ড্রাম, মগ তুলে নিয়ে কুয়ায় ছুটল সবাই।

গোটা দুই চালা জ্বলে শেষ। বড় ঘরটায় আগুন ধরেছে। পানি নিয়ে ওটা বাঁচাতে ছুটল। টিনের চাল, গাছের বেড়া, তাই ঘরের আগুন দ্রুত ছড়াতে পারল না। নিভিয়ে ফেলা গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে ঢুকল লোকটা। এক দিকের বেড়া পুড়েছে, ঘর কালিতে মাখামাখি। ছাইয়ে ভরা মেঝেতেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

ধরাধরি করে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে খাটিয়ায় শুইয়ে দিল তিন গোয়েন্দা। হারিকেন জ্বালল। প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল লোকটা, চোখ বন্ধ। জখম-টখম

'দেখে তো ইংরেজ মনে হয় না আপনাকে। কিন্তু ইংরেজি তো ভালই বলছেন?'

'আমি ব্রাজিলিয়ান। নাম বুয়েনো-ন্যানসো। রিওতে স্কুলে ইংরেজি শিখেছি।'

বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, শুয়ে পড়ল আবার লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড জিরিয়ে নিয়ে বলল, 'রিওতে এখন স্লোগান, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার : গো ওয়েস্ট, ইয়াং ম্যান। আমাদের সরকার চায়, এই পতিত অঞ্চলটাও আবাদ হোক। তাই আমি চলে এসেছি এখানে। হয়তো বোকামিই করেছি,' চোখ বুজল ন্যানসো।

খানিক পরেই মেলল আবার। ম্লান আলোয় জ্বলজ্বল করছে চোখের তারা। নিজেকে যেন সান্ত্বনা দিল, 'না, বোকামি করিনি। নতুন দুনিয়া খুঁজতে বেরিয়ে কলম্বাস কি বোকামি করেছিলেন? আমেরিকানরা যদি মনে করত, পশ্চিমে যাওয়া বোকামি, তাহলে কি গড়ে উঠত আজকের ইউনাইটেড স্টেটস?' কনুয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'জানো, কি বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে এখানে? পৃথিবীর বৃহত্তম পতিত জায়গা এটা। এর বেশিরভাগ জায়গাতেই মানুষ যায়নি এখনও। খনিজ আর বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চল। শুধু এই এক আমাজনই পৃথিবীর সব মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে পারে। এখানে এখন প্রতি বর্গমাইলে একজনেরও কম মানুষ। লোক দরকার, বুঝেছ, অনেক লোক দরকার এখানে। আমাজনকে আবাদ করতে পারলে দুনিয়ার মানুষ আর না খেয়ে মরবে না। যারা এখানে আগে এসে বসত করবে, কাজের লোক হলে তাদের কপাল খুলে যাবে, আমি লিখে দিতে পারি।'

ন্যানসোর কথাতেই বোঝা যায়, উচ্চশিক্ষিত।

'ঠিক আছে, কথা পরে হবে,' বলল কিশোর। 'আপনি এখন বিশ্রাম নিন।'

শুয়ে পড়ল আবার ন্যানসো, কিন্তু কথা বন্ধ করল না, 'দুনিয়ায় কেন এত হাহাকার জানো? কেন শান্তি নেই? মূল সমস্যাটা হলো, ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা মিটাতে পারবে আমাজন। আর সেটা মিটলেই পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসবে।'

'আপনি দুর্বল। ঘুমোন?'

হাসি ফুটল ন্যানসোর ঠোঁটে। 'পাগলের প্রলাপ ভাবছ তো? সকালেই বুঝবে, মিছে কথা বলছি না আমি। এখানকার মাটিতে কি জাদু আছে বুঝবে।'

পোড়া বেড়ার দিকে তাকাল কিশোর। ভেঙে ফেলা আসবাবের-ওপর চোখ বোলাল। গান-র‍্যাক খালি, একটা বন্দুকও নেই, সব নিয়ে গেছে। ড্রয়ারগুলো শূন্য। বাক্স খালি। মানিব্যাগ ফাঁকা। 'ফতুর করে দিয়ে গেছে আপনাকে,' বলল সে। 'এখানে থাকবেন কি করে আর?'

চুপ করে রইল ন্যানসো।

'আপনি শিক্ষিত লোক, কথা শুনেই বুঝেছি। কিছু মনে করবেন না, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি, এখানে আসার আগে কি কাজ করতেন?'

'রিওতে কলেজের লেকচারার ছিলাম।'

'তাহলে আবার রিওতেই ফিরে যেতে পারেন। এখানে থেকে কি করবেন। নানা উটকো ঝামেলা, ডাকাত, ইনডিয়ান…এই ভীষণ জঙ্গলে একা কারও পক্ষে কিছু করা সম্ভব না…আমি আর কি বোঝাব? আপনিই আমাকে পড়াতে পারেন। এক কাজ করুন, কাল চলুন আমাদের সঙ্গে।'

ন্যানসোর শুয়োরের খোঁয়াড় খালি, যা ছিল নিয়ে গেছে ভ্যাম্প। গোয়ালে একটা গরু নেই, জ্যান্ত নিতে পারেনি, জবাই করে মাংস নিয়ে গেছে।

কিন্তু বাগান নিয়ে যেতে পারেনি। ধান আর গমের খেত আছে, আছে সীম, লেটুস, শশা, গাজর, বাঁধাকপির বাগান।

পরদিন সকালে সে-সব দেখে তাজ্জব হয়ে গেল কিশোর। 'আমি তো ভেবেছিলাম, এত বৃষ্টি, মাটির রসকস কিছু নেই!'

'কিন্তু আছে যে, এখন তো বুঝতে পারছ?' হাসল ন্যানসো। 'বরং অনেক বেশি আছে। দুনিয়ার চাষীদের সবক্ষণের চিন্তা—কি করে বেশি ফলাবে, বড় ফলাবে। এখানে এলে হয়তো ভাবতে শুরু করত, কি করে কম ফলিয়ে ফলন স্বাভাবিক রাখা যায়। এত বেশি ফলে, ঠেকিয়ে রাখা যায় না। রাতারাতি বেড়ে যায় ঘাসের জঙ্গল। রোজ নিড়ানি লাগে। বিশ্বাস করবে? এক রাতে এক ফুট বেড়ে যায় বাঁশের কোঁড়। ইউনাইটেড স্টেটসে শসার যে চারা বড় হতে দুই-তিন হপ্তা লাগে, এখানে লাগে বড় জোর তিন দিন। আর দেখো, কমলার সাইজ দেখো।'

হাঁ হয়ে গেল কিশোর। পাকেনি এখনও। এখনই ফুটবলের সমান একেকটা, এত ধরেছে, পাতা দেখা যায় না। 'এগুলো কমলা!'

'কমলা। এখান থেকে বীজ নিয়ে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চাষের চেষ্টা হচ্ছে। ফলছে ঠিকই, কিন্তু কিছুতেই এত বড় করতে পারছে না। এর তিন ভাগের এক ভাগ বড় হয় ওগুলো।'

ফল গাছেরও অভাব নেই। আম, অ্যাভোকাডো, কোকা, কাঁটাফল গাছে ধরে আছে রাশি রাশি ফল। কলার ঝাড়ের প্রায় প্রতিটি গাছেই কলা। খানিকটা খোলা জায়গায় ঘন সবুজ হাতিঘাস, তারপরে শুরু হয়েছে মূল্যবান গাছের জঙ্গল। লোহাকাঠ, মেহগনি, সিডার ও রবার গাছের সীমা-সংখ্যা নেই। আট-দশতলা বাড়ির সমান উঁচু ব্রাজিল-বাদাম আর মাখন-বাদাম গাছে যে কত বাদাম ধরেছে, আন্দাজ করা মুশকিল। আর আছে ছড়ানো বিশাল ডুমুর গাছ। আরও কিছু গাছ আছে, যেগুলো থেকে তেল বের করা যায়, সেই তেল কারখানার কাজে লাগে।

'ইদানীং ইউনাইটেড স্টেটস আগ্রহ দেখাচ্ছে আমাজনের দিকে,' বলল ন্যানসো। 'আমাজন ইনস্টিটিউট গড়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ডজন ডজন বিশেষজ্ঞ পাঠাচ্ছে আমাজন বেসিনে গবেষণা চালানোর জন্যে। কয়েকজন আমার ফার্ম দেখে গেছে। উৎসাহ দিয়ে গেছে ওরা।'

ন্যানসোর হাত ধরল কিশোর। 'আমাকে মাপ করবেন, স্যার, আপনাকে চলে যেতে বলেছি বলে। এখন আমারই থাকতে ইচ্ছে করছে। চলি, গুড বাই।'

বজরা-বহরে ফিরে এল অভিযাত্রীরা। শিস ভাসাল।

বুয়েনো স্যানসোর অজান্তে তার গান-র‍্যাকে একটা রিভলভার, আর ৩০০০-উইনচেস্টার রাইফেলটা রেখে নিয়ে এসেছে কিশোর। কয়েক বাক্স গুলি আর কিছু কাপড়-চোপড়ও রেখে এসেছে। বিছানার ওপর মানিব্যাগটা পাবে স্যানসো, তবে এখন আর সেটা খালি নয়, তাতে কিছু ডলার রয়েছে।

দিয়েছে যতটা, এনেছে তার চেয়ে অনেক বেশি—অসাধারণ ওই শিক্ষকের দুর্জয় সাহস আর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের খানিকটা, যা ছাড়া টিকতে পারবে না এই ভয়াবহ আমাজনে।

ছয়

দিন যায়, ড্যাম্পের আর কোন সাড়া নেই। কিন্তু কিশোর জানে, তাদের আগে আগে চলেছে ডাকাতের দল। এখনও হয়তো বুঝতে পারেনি, যাদেরকে খুঁজছে, তারা রয়েছে পেছনে। যেই বুঝবে, পথে কোথাও ঘাপটি মেরে থাকবে। বজরা-বহর কাছাকাছি হলেই দখলের চেষ্টা চালাবে।

রোজই কিছু না কিছু নতুন যাত্রী যোগ হচ্ছে বজরা-বহরে। একটা টকটকে লাল আইবিস পাখি, একটা গোলাপী স্পুনবিল, একটা সোনালি কনিউর, একটা কিউরেসো আর একটা কক অভ দা রক ধরল। সব কটাই পোষ মানল।

জানোয়ার ধরার নেশায় পেয়েছে কিশোরকে। এত ধরেও কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছে না।

'আসল দুটোকেই ধরতে পারলাম না এখনও,' একদিন বলল সে। 'অ্যানাকোণ্ডা আর টিগ্রে। মিরাটো, কিভাবে ধরি, বলো তো?'

তরুণ ইনডিয়ানের ওপর বিশ্বাস জন্মে গেছে তিন গোয়েন্দার। পছন্দ করেছে তাকে। সে-ও পছন্দ করেছে ওদেরকে। অবসর সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টলডোর ছাতে বসে গোয়েন্দাদের নিঙগুয়া জেরাল (জেনারেল ল্যাংগোয়েজ) শেখায় সে। আমাজনে প্রতিটি ইনডিয়ান গোত্রেরই নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এছাড়া একটা সাধারণ ভাষা চালু আছে, যেটা আমাজন বেসিনের সবাই জানে, এখানকার 'ইনটারন্যাশ-নাল' ভাষা বলা চলে। বাইরের যারা ওখানে বেড়াতে কিংবা থাকতে যায়, ওই ভাষা শেখা তাদের জন্যে অতি জরুরী। কারণ বেশিরভাগ ইনডিয়ানই পর্তুগীজ জানে না, আর ইংরেজি প্রায় কেউই জানে না।

'শিগ্রি *এল-টিগ্রের* দেখা পাবে,' বলল মিরাটো। 'বাঘের রাজ্যে চলে এসেছি।'

'এল-টিগ্রে কিংবা জাগুয়ারের চেয়ে বাঘ বলাটাই সহজ। তাই না?' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বাঘই তো ওটা।'

'বাঘের সঙ্গে আবার কুস্তি করতে যেয়ো না,' হেসে মুসাকে বলল রবিন। 'সাপ

আর পিঁপড়েখেকো মনে কোরো না টিগ্রেকে। এক থাবায় টারজানগিরি খতম করে দেবে।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর। 'ভীষণ একরোখা। হার্টে গুলি খেয়েও নাকি থামে না, শিকারীর দিকে তেড়ে আসে। সহজে দম বেরোতে চায় না।'

ঠিকই বলেছে মিরাটো, বাঘের রাজ্যে ঢুকেছে ওরা। রাতে প্রায়ই শোনা যায় গর্জন। কাছ থেকে ভয়ঙ্কর শোনায়। বাতাসে কাঁপন তোলে সে-শব্দ, সেই সঙ্গে বুকের ভেতরেও।

একদিন রাতে দেখা দিল টিগ্রে।

হ্যামকে শুয়ে আছে কিশোর, মুখ ফিরাতেই দেখে বাঘ। বিশ ফুট দূরে। তাকে দেখতে পায়নি বাঘটা, আগুনের কুণ্ডের দিকে চেয়ে আছে কৌতূহলী চোখে। বড় বড় হলুদ চোখ দুটো আগুনের মতই জ্বলছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেড়ালের মত লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, বেড়ালের মতই হাঁ করে জিভ বের করে হাই তুলল।

বাঘের এই হঠাৎ আগমন আশা করেনি কিশোর। খাঁচা রেডি হয়নি, জাল তৈরি নেই, লোকজন সব ঘুমাচ্ছে; কেউ নৌকায়, কেউ তার কাছাকাছি—হ্যামকে কিংবা মাটিতে।

ওদের ডাকতে গেলে সতর্ক হয়ে যাবে বাঘটা।

কিশোরের পাশে রাখা আছে বন্দুক, কিন্তু এত সুন্দর জীবটাকে গুলি করতে চায় না সে। বিশ ফুট দূরে বাঘ শুয়ে আছে, ঘুমাতেও পারবে না। খুব তাড়াতাড়ি বাঘটারও নড়ার ইচ্ছে নেই, বোঝা যায়।

আগুনে কাঠ ফেলতে উঠল একজন ইনডিয়ান।

ঝট করে উঠে বসল বাঘ।

বন্দুকে হাত চলে গেল কিশোরের। কিন্তু তেমন বিপদে না পড়লে গুলি করবে না। একে তো এই হ্যামকে থেকে নিশানা ঠিক রাখতে পারবে না, তার ওপর এক গুলি খেয়ে হয়তো কিছুই হবে না বাঘের, মাঝখান থেকে শান্ত বেড়ালটা উন্মত্ত শয়তান হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, এখন তো দেখে শান্ত বেড়ালই মনে হচ্ছে ওটাকে। কিশোর জানে, সব জানোয়ারই মানুষকে এড়িয়ে চলে। নিতান্ত বাধ্য কিংবা কোণঠাসা না হলে সহজে আক্রমণ করে না। জাগুয়ারও করে না। কিন্তু মানুষখেকো হলে আলাদা কথা।

ঘুমের ঘোরে কাঠ ফেলছে লোকটা। কাছে বসে আছে ভয়ঙ্কর এক জীব, তাকে লক্ষ্য করছে, খেয়ালই নেই তার।

ঘামছে কিশোর। বন্দুকে হাত। এমন করে তাকিয়ে আছে কেন বাঘটা? মানুষখেকো?

কাজ শেষ করে আবার শুয়ে পড়ল লোকটা।

বাঘটা শুয়ে পড়ল না। না, মানুষখেকো বোধহয় না। লোকটা নড়াচড়া করাতে সতর্ক হয়েছিল।

হাঁপ ছাড়ল কিশোর।
হঠাৎ পেছনের জঙ্গলে তাপিরের তীক্ষ্ণ নাকি ডাক শোনা গেল। চকিতে সেদিকে ঘুরে গেল হলুদ-কালো বিশাল মাথাটা। নিঃশব্দে উঠে ঝোপের ভেতরে হারিয়ে গেল বাঘ।
অপেক্ষা করছে কিশোর।
এক সঙ্গে হুইসেল বাজল এবং বাজ পড়ল যেন বনের ভেতরে। তাপিরের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, আর বাঘের ভীষণ গর্জন। কয়েক সেকেণ্ড ছুটোপুটির পর থেমে গেল সব শব্দ।
ক্যাম্পের স াই জেগে গেছে।
'বাঘে ধরল া!' হ্যামক থেকে ভেসে এল মুসার কম্পিত কণ্ঠ।
'ভাগ্যিস আগুন জ্বলছে!' বলল রবিন।
হ্যামকে থেকেই জানাল কিশোর, কি হয়েছে।
এরপর আবার ঘুমাতে দেরি হলো সকলেরই।
সকালে নাস্তা সেরে বেরোল অভিযাত্রীরা। বাঘের পায়ের ছাপ ধরে এগোল।
স্যুপ-প্লেটের সমান বড় এ একটা ছাপ, গোল। পিরিচের কিনারে আঙুলের ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু নখের দাগ নেই। হাঁটার সময় নখ ভেতরে লুকিয়ে রাখে জাগুয়ার, বেড়ালের মত।
'দেখে মনে হয়,' মুসা বলল, 'পায়ে মখমলের প্যাড লাগানো।'
'ওই প্যাড লাগানো থাবারই থাপ্পড় খেয়ে বড় বড় ষাঁড়ের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়,' মিরাটো বলল।
আগে আগে হাঁটছে সে। সে না থাকলে এই ছাপ অনুসরণ করে এগোতে পারত না তিন গোয়েন্দা, বুঝতই না কিছু।
তাপিরকে যেখানে আক্রমণ করেছে বাঘটা, সে-জায়গাটায় এসে দাঁড়াল ওরা। ঝড় বয়ে গেছে যেন। ঝোপের ডাল ভাঙা, লতা ছেঁড়া, পাতা ছেঁড়া, খানিকটা জায়গার ঘাস দলে-মুচড়ে রয়েছে। রক্ত লেগে আছে।
কিশোর আশা করেছিল, তাপিরের মড়ির অবশিষ্টটা দেখতে পাবে। হতাশ হলো। কিছুই নেই। তারমানে জাগুয়ার আর ফিরে আসবে না এখানে। শিকার কাহিনীতে পড়েছে, মড়ির কিছু হাড়গোড় বাকি থাকলেও খাওয়ার জন্যে ফিরে আসে বাঘ। কাছাকাছি ওত পেতে থাকে তখন শিকারী। ফাঁদ পেতে জানোয়ারটাকে ধরে, কিংবা গুলি করে মারে। ধরার আশায়ই দলবল নিয়ে এসেছে কিশোর, লাভ হলো না।
'দেখো,' হাত তুলল রবিন। 'নিশ্চয় ইনডিয়ানরা গেছে।'
'ইনডিয়ান না,' মিরাটো মাথা নাড়ল। 'বাঘ।'
'এত চওড়া! কটা বাঘ গেছে?'
'একটাই,' মুচকি হাসল মিরাটো। 'তাপির টেনে নিয়ে গেছে।'

অবিশ্বাস্য কাণ্ড। ঝোপের মাঝে তিন-চার ফুট চওড়া একটা পথ করে রেখেছে, রোলার চালানো হয়েছে যেন ওখান দিয়ে।

'এত ভারিটাকে টেনে নিল?' চোখের সামনে দেখছে আলামত, তবু মুসার বিশ্বাস হচ্ছে না।

ওই পথ ধরে এগোল ওরা। সাবধানে খুব আস্তে আস্তে পা ফেলছে। যে কোন মুহূর্তে মড়ির সামনে পড়তে পারে, হয়তো বা বাঘেরও।

কিন্তু শেষ আর হতে চায় না পথ। মাইলখানেক পেরিয়ে নদীর পাড়ে এসে পড়ল ওরা। চিহ্ন শেষ।

ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর। নদীটা কয়েক মাইল চওড়া।

'ওই নদী পেরিয়েছে!' গালে আঙুল বাঘল রবিন।

'পেরোলে অবাক হব না,' মিরাটো বলল। 'এর চেয়ে বেশি ভার নিয়ে সাঁতরে নদী পেরোতে দেখেছি টিগ্রেকে। তবে মনে হয়, এই বাঘটা তা করেনি। পানিতে নেমে শিকারকে খানিকদূর টেনে নিয়ে গিয়ে এপাড়েই আবার কোথাও উঠেছে। এদিকেও হতে পারে, ওদিকেও। হয়তো তার বৌ-বাচ্চা আছে, তাদেরকে নিয়ে খাবে।'

এ-রকম ঘটনার কথা কিশোর পড়েছে। ঘোড়া মেরে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে জাগুয়ারকে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছেন একজন বিখ্যাত ব্রাজিলিয়ান শিকারী জেনারেল রনডন। শিকারীর চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে নদীতে নেমে কিনারের পানি দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে খানিক দূর, যাতে চিহ্ন না থাকে। তারপর আবার উঠে পানির ধারে একটা ঘন ঝোপে লুকিয়েছে ঘোড়াটাকে।

তাপির নিয়ে যেখানে নদীতে নেমেছে জাগুয়ার তার আশেপাশে কিছুদূর খোঁজাখুঁজি করল মিরাটো। কিন্তু আর কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না। বিড়বিড় করল, 'নদীর ওপারেই চলে গেল নাকি?'

ক্যাম্পে ফেরার পথে জাগুয়ারের ক্ষমতার আরও নজির দেখা গেল। মাটি থেকে ছয়-সাত ফুট উঁচুতে বিশাল এক গাছের বাকল ফালাফালা। মিরাটো জানাল, ওখানে নখ ধার করেছে টিগ্রে। নখের আঁচড়ের কয়েক ফুট নিচে খসখসে বাকল মসৃণ হয়ে গেছে। জানোয়ারটার পেটের ঘষায় হয়েছে ওরকম।

সাত

নৌকা চলেছে।

বড় বজরার গলুইয়ের কাছে বসে আছে রবিন। হঠাৎ হাত তুলল সে। কি ব্যাপার? দেখতে এল অন্য দুই গোয়েন্দা।

ইশারায় দেখাল রবিন।

নদীর পাড়ে এক জায়গায় ঝোপঝাড় সামান্য ফাঁকা। একটা মরা গাছ পানিতে

পড়ে আছে। তার ওপর বসে আছে একটা জাগুয়ার। মুখ আরেক দিকে ফেরানো, মাছ ধরায় ব্যস্ত সে।

লেজ দিয়ে পানিতে বাড়ি মারছে, পানিতে ফল কিংবা বড় পোকা পড়লে যেমন হয়, তেমনি আওয়াজ করছে।

হঠাৎ থাবা মারল জাগুয়ার। পানির ওপরে তুলতেই দেখা গেল নখে গেঁথে ছটফট করছে একটা মাছ।

আরাম করে চিবিয়ে মাছটাকে খেলো সে। আবার লেজ নামাতে গিয়ে কি মনে করে মুখ ফেরাল। অলস ভঙ্গিতে দেখল নৌকা আর যাত্রীদের। মনে মনে বোধহয় বলল, নাহ্, আর হবে না। গেল আমার মাছ ধরা। আস্তে করে উঠে গাছ থেকে লাফিয়ে নামল মাটিতে। আরেকবার নৌকার দিকে চেয়ে, রাজকীয় চালে হেলেদুলে হেঁটে ঢুকে গেল বনে।

দাঁত বের করে হাসছে মিরাটো। 'খুব চালাক,' এমনভাবে বলল, যেন ওটা তার পোষা বাঘ।

'কাণ্ডটা করল কি!' রবিনের দিকে ফিরল মুসা। 'নথি তোমার বই কি বলে? সত্যি লেজের বাড়ি দিয়ে মাছ ডেকে আনল?'

'নিজের চোখেই তো দেখলাম,' রবিন বলল। 'অবিশ্বাস করি কি করে? দাঁড়াও, আসছি।' কেবিনের ভেতরে গিয়ে একটা বই নিয়ে এল। 'নেচারালিস্ট ওয়ালেসের লেখা।' বইয়ের পাতা উল্টে এক জায়গায় এসে থামল। 'এই যে, লিখেছেন : ব্রাজিলের জঙ্গলের সব চেয়ে ধূর্ত জীব জাগুয়ার। যে কোন পাখি কিংবা জানোয়ারের ডাক নকল করতে পারে। ডেকে কাছে নিয়ে আসে। তারপর ধরে ধরে খায়। মাছ ধরে অদ্ভুত কৌশলে। লেজ দিয়ে পানিতে বাড়ি মারে। ফল কিংবা পোকা পড়েছে ভেবে ওপরে উঠে আসে মাছ, ধরে ফেলে তখন জাগুয়ার। কাছিমও ধরতে পারে। শুধু তাই না, পানিতে কাউফিশকেও আক্রমণ করে বসে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে জানিয়েছে, একটা কাউফিশকে মেরে ফেলতেও নাকি দেখেছে সে, বিশাল ওজনের প্রাণীটাকে সহজেই টেনে তুলেছে ডাঙায়।'

'খাইছে!' কিশোরের দিকে ফিরল মুসা। 'ওই জীবকে ধরতে চাও? পাগল!'

আগ্রহ দেখাল জিবা, 'নিন্দ কি টিগ্রে ধরতে চাও?'

'হ্যাঁ,' কিশোর আশা করল, জিবা তাকে সাহায্য করতে চায়।

'কিন্তু টিগ্রে তো ধরতে পারবে না।'

'কেন?'

'বিশ-তিরিশজন দরকার। আমরা আছি নয়জন, তা-ও তিনজন...' মুসার ওপর চোখ পড়তে শুধরে নিল, 'দু-জন ছেলেমানুষ।'

ভুল বলেনি জিবা, মনে মনে স্বীকার করল কিশোর। কিন্তু যে যা-ই বলুক, টিগ্রে না ধরে ছাড়বে না সে। গায়ের জোরে না পারলে বুদ্ধির জোরে ধরবে।

দুপুরে নৌকা তীরে ভেড়ানোর নির্দেশ দিল সে। খাওয়া সেরে নিয়ে কাজে

লাগিয়ে দিল লোকজনকে। জিবা প্রতিবাদ জানালে বলল, 'দেখো, বাঘ না ধর... আমি যাচ্ছি না এখান থেকে। যত দিন লাগে লাগুক।'

সোজা, শক্ত দেখে বাঁশ কাটা হলো। সেগুলোকে কাঁচা লিয়ানা লতা দিয়ে বেঁধে মজবুত খাঁচা তৈরি হলো। একটামাত্র দরজা রাখা হলো খাঁচার।

ইচ্ছে করেই ছোট রেখেছে খাঁচাটা কিশোর। যাতে ভেতরে ঢুকে নড়াচড়ার বিশেষ জায়গা না পায় বাঘ, তাহলে ভাঙতে পারবে না। চার ফুট উঁচু আর চার ফুট পাশে, লম্বা দশ ফুট।

নদীতে কোন পথে পানি খেতে যায় বাঘ, খুঁজে বের করল মিরাটো।

পথের ওপর একটা গর্ত খুঁড়তে বলল কিশোর, সবার সঙ্গে সে-ও হাত লাগাল। জিবাকে দিয়ে কোন কাজই করানো যাচ্ছে না। একটা গাছের তলে বসে বকবক করছে আপনমনে।

গর্ত খোঁড়া শেষ হলো। ছয় ফুট গভীর, ব্যাসও প্রায় ছয় ফুট। কয়েকটা বাঁশ কেটে টুকরো করে বিছানো হলো গর্তের ওপরে। লতাপাতা দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেয়া হলো, যাতে গর্ত আছে বোঝা না যায়। মোটা দড়ির ফাঁস বানিয়ে তার ওপর রাখল কিশোর, সেটাকেও ঘাসপাতা দিয়ে ঢাকা হলো। গর্তের প্রায় ওপরে এসে ঝুঁকেছে বিশাল এক ডুমুর গাছের ডাল। দড়ির আরেক মাথা ওই ডালে বেঁধে দিল সে। বাঘ এসে গর্তে পড়লে ওই ফাঁসের মধ্যখান দিয়ে পড়বে, আটকে যাবে।

খাঁচাটা এনে রাখা হলো গর্তের কাছে, ঝোপের ভেতর লুকিয়ে। বাঘ ধরা পড়লেই যাতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে ঢোকানো যায় খাঁচায়।

'কোন কাজ হবে না,' নাকমুখ কুঁচকে বলল জিবা।

কান দিল না কেউ।

ক্যাম্পে ফিরে অপেক্ষায় রইল সবাই।

দিন শেষ। রাতের শুরুতেই গর্তের কাছে চেঁচামেচি শোনা গেল। গিয়ে দেখা গেল, বাঘ নয়, ঝামেলা পাকানোর ওস্তাদ তাপির। হতাশ হলো কিশোর। একটা আছে, আরেকটা নিয়ে কি করবে? নৌকায় জায়গাও নেই। বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হলো।

ভারি জানোয়ারটাকে টেনে তুলে ফাঁসমুক্ত করে গর্তের মুখে আবার লতাপাতা বিছাতে, ফাঁস পাততে, দুই ঘণ্টা লেগে গেল। অযথা সময় নষ্ট আর পরিশ্রম।

আবার ফিরে এল ওরা ক্যাম্পে। আবার অপেক্ষার পালা। সময় যাচ্ছে। বাঘের সাড়াশব্দ নেই।

'মিরাটো,' কিশোর বলল। 'বাঘ তো নেই মনে হচ্ছে। অন্য জানোয়ার এসে খামোকা ঝামেলা করবে। কি করি?'

'বাঘকে ডেকে আনতে হবে,' শান্তকণ্ঠে বলল মিরাটো।

কিশোর, রবিন এমনকি মুসাও জানে কাজটা অসম্ভব নয়। ভারতের জঙ্গলে আসল বাঘকেও ডেকে এনে গুলি করে মেরেছেন জিম করবেট আর কেনেথ

আণ্ডারসনের মত শিকারীরা। করবেট চিতাবাঘকেও ডেকে এনেছেন। কিশোর জানে, উত্তর আমেরিকার মুজ হরিণকেও ডেকে আনা যায়। আনে শিকারীরা।

পোঁটলা থেকে একটা শিঙ্গা বের করল মিরাটো। রওনা হলো গর্তের দিকে। সঙ্গে চলল তিন গোয়েন্দা।

গর্তের কাছ থেকে খানিক দূরে নদীর দিকে পেছন করে পথের পাশে ঝোপে ঢুকল মিরাটো। তার পাশে বসল তিন কিশোর।

শিঙ্গায় ফুঁ দিল মিরাটো। নিখুঁত জাগুয়ারের ডাক, কাশি দিয়ে শুরু হলো, ভারি গর্জন শেষ হলো কয়েকবার খোঁত খোঁত করে।

স্তব্ধ হয়ে গেল সারা বন, নিমেষে চুপ হয়ে গেল সমস্ত ডাকাডাকি। ভয়ে অবশ হয়ে গেছে যেন সব। কিন্তু বাঘ সাড়া দিল না।

'ধারেকাছে নেই,' নিচুকণ্ঠে বলল কিশোর।

খানিক বিরতি দিয়ে দিয়ে সারা রাতই ডাকল মিরাটো।

ভোরের একটু আগে আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে ওরা, এই সময় শোনা গেল কাশি। নদীর অন্য পাড়ে।

জায়গা বদলাল চারজনে। গর্তের উল্টো ধারে আরেকটা ঝোপের ভেতরে ঢুকল, মুখ এখন নদীর দিকে। আলো ফুটছে। কালো নদীর পানি ধূসর হয়েছে, কিন্তু বনের তলায় আগের মতই অন্ধকার।

ডাকল আবার মিরাটো। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল। আবার ডাক। আবার জবাব। এগিয়ে আসছে বাঘ। আর মাইলখানেক দূরেও হবে না।

খানিকক্ষণ আর সাড়া নেই। হঠাৎ যেন একেবারে কানের কাছে বাজ পড়ল। নদী পেরিয়ে এসেছে জাগুয়ার। আর ডাকার সাহস হলো না মিরাটোর। চুপ করে রইল।

আরও কাছে বাজ পড়ল আরেকবার।

উত্তেজনায়, ভয়ে চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেছে যেন ওরা। ঝোপের দিকে চেয়ে আছে। তাই জানোয়ারটাকে দেখতে পেল না। প্রচণ্ড গর্জনে চমকে উঠল। ঝড় উঠল যেন গর্তের মধ্যে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'পড়েছে! পড়েছে!'

গর্তের কাছে দৌড়ে এল ওরা। চেঁচামেচি শুনে ক্যাম্প থেকে ইনডিয়ানরাও ছুটে এল।

ঘূর্ণিঝড় বইছে যেন গর্তের ভেতরে। পাতা, লতা আর ধুলো উড়ছে। মাঝে মাঝে কালো-হলুদ রঙের ঝিলিক।

গর্তের বেশি কাছে যাওয়ার সাহস নেই কারও।

সবাই খুশি, জিবা ছাড়া। মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছে ডুমুর গাছটার গোড়ায়।

টানটান হয়ে গেছে দড়ি, ডালটা যেন তুফানে দুলছে। নুয়ে যাচ্ছে বার বার,

ঝটকা দিয়ে সোজা হচ্ছে। বোঝা গেল, ফাঁসে আটকেছে বাঘ।

ফাঁসে তো পড়ল, এখন আসল কাজটা বাকি। বাঘকে খাঁচায় পোরা। কি করে ঢোকাবে? গর্জনের দাপটেই বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে সবার।

খাঁচাটা গর্তের একেবারে কিনারে নিয়ে যেতে বলল কিশোর। গাছে চড়ে ডাল থেকে দড়িটা খুলে আনল। তারপর খাঁচার খোলা দরজা দিয়ে দড়ির মাথা ঢুকিয়ে উল্টো দিকের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে বের করল। এখন সবাই মিলে টানলে উঠে আসবে বাঘ, দরজা দিয়ে ঢুকতে বাধ্য হবে। শুনতে খুব সহজ, কিন্তু যারা করছে, তারা বুঝতে পারছে কাজটা কতখানি কঠিন।

খাঁচার পেছনে ঝোপে লুকিয়ে দড়ি ধরে টান দিল সবাই, জিবা বাদে। সে এসবে নেই, সাফ মানা করে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে ছিল, এখন বসে পড়েছে ডুমুর গাছের গোড়ায়। কাজ তো করছেই না, টিটকারি দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে ইনডিয়ানদের। ধমক দিয়েও চুপ করানো যাচ্ছে না তাকে।

চমৎকার ফন্দি করেছে কিশোর। উঠে এল জাগুয়ার। খাঁচার দরজায় মাথা ঢোকাল, আরেকটু হলেই ঢুকে যাবে শরীরটা। যারা টানছে তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু মুখ ঘোরাতেই চোখ পড়ল জিবার ওপর।

আর যায় কোথায়? ধরেই নিল, সমস্ত শয়তানীর মূলে ওই দু-পেয়ে জীবটা। জ্বলে উঠল হলুদ চোখ। ভয়ঙ্কর গর্জন করে হ্যাঁচকা টান মারল দড়িতে।

এতগুলো লোক মিলেও আর ধরে রাখতে পারল না, সরসর করে বেরিয়ে গেল দড়ি, ঘষা লেগে তাদের হাতের চামড়া ছিলল।

আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে গাছে উঠতে শুরু করল জিবা।

মাথা ঠাণ্ডা থাকলে হয়তো এই ভুল করত না। কারণ, তার জানা আছে জাগুয়ার গাছেও চড়তে পারে।

'গুলি করো! গুলি করো!' চেঁচাচ্ছে জিবা।

মুসার রাইফেল আর কিশোরের বন্দুক সঙ্গেই রয়েছে। কিন্তু গুলি করল না কেউ। এত কষ্ট করে ডেকে এনে ধরার পর মারতে চায় না বাঘটাকে।

ওপরে উঠে চলেছে জিবা। ভাবছে উঁচুতে সরু ডাল, ভেঙে পড়ার ভয়ে ওখানে উঠবে না বাঘ। তা-ই হয়তো করত, কিন্তু জিবার কপাল খারাপ, সে নিজেই যেতে পারল না ওখানে। ঘন পাতার আড়ালে রয়েছে বোলতার বাসা, না দেখে হাত দিয়ে বসল তাতে।

আর যায় কোথায়। কার এতবড় সাহস! বোলতার বাসায় হাত দেয়! রাগে বনবন করে উঠল ওগুলো। চোখের পলকে এসে ছেঁকে ধরল জিবাকে। বিচার-আচার-শুনানীর বালাই নেই, শরীরের যেখানে খোলা পেল সেখানেই হুল ফুটিয়ে দিল।

'বাবাগো! মাগো!' বলে চেঁচিয়েও রেহাই পেল না মিরাটো।

ওদিকে উঠে আসছে জাগুয়ার। বেয়াড়াপনা আজ ঘুচিয়েই ছাড়বে তার।

নিচ থেকে দেখছে দর্শকরা। গাছের বাকলে নখ বিঁধিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠে যাচ্ছে বাঘটা। শরীর লম্বা করে মিশিয়ে ফেলেছে ডালের সঙ্গে, অপূর্ব সুন্দর একটা কালো-হলুদ মোটা সাপ যেন।

কিন্তু জাগুয়ারের হাঁ করা মুখের দিকে তাকিয়ে কোন সৌন্দর্য দেখতে পেল না জিবা। তার মনে হলো, নরকের ইবলিসের দুটো চোখ, হাঁ করা চোয়ালে ধারাল দাঁতগুলো শয়তানের দাঁত। মুহূর্ত পরেই তাকে কেটে টুকরো টুকরো করবে। চেঁচিয়ে বন কাঁপাচ্ছে না আর বাঘ, গম্ভীর গোঁ গোঁ করছে কেবল। জিবার মনে হলো, ব্যাটা হাসছে! বাগে পেয়ে বেড়াল যেমন ইঁদুরকে খেলায়, টিগ্রে বদমাশটাও তা-ই করছে!

হা-হা করে হাসতে ইচ্ছে করছে মুসার। জাগুয়ারের ভয়ে পারছে না। যদি শব্দ শুনে তাদের দিকে নজর দেয় আবার? জিবার শাস্তিতে খুব খুশি সে। উচিত শিক্ষা হয়েছে বেয়াদবটার। গুলি সে অবশ্যই করবে জাগুয়ারকে, তবে শেষ মুহূর্তে। যখন দেখবে জিবার ঘাড় ভাঙতে উদ্যত হয়েছে। ততক্ষণ চালিয়ে যাক বোলতারা।

কিন্তু কিশোর আর চুপ থাকল না। জাগুয়ারের গলায় আটকে আছে এখনও ফাঁস, দড়ির আরেক মাথা ঝুলছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই মাথাটা গাছের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিল সে।

পাগলের মত দুই হাতে বোলতা তাড়াচ্ছে জিবা।

আরও কয়েক ইঞ্চি উঠে দড়িতে টান পড়ল। হঠাৎ বাধা পেয়ে রেগে গেল আবার জাগুয়ার, প্রচণ্ড গর্জন করে হ্যাঁচকা টান মারল। টানাটানি আর ঘষাঘষিতে দড়ির একটা জায়গা নরম হয়ে গেছে, পট করে গেল ছিঁড়ে।

এবার ভয় পেল কিশোর।

হাসি উধাও হয়ে গেল মুসার মুখ থেকে।

রবিন হতবাক।

ইনডিয়ানরা বোবা।

আর বুঝি বাঁচানো গেল না জিবাকে!

বিপদটা জিবাও বুঝতে পেরেছে। কেঁদে ফেলল সে। বোলতার পরোয়া আর করল না, উঠে যেতে লাগল ওপরে। হুলের যন্ত্রণা এক সময় কমবে, কিন্তু জাগুয়ারে ধরলে নির্ঘাত মৃত্যু।

জাগুয়ারটা নাছোড়বান্দা। উঠে যাচ্ছে।

হাতের টিপ ভাল না কিশোরের, বন্দুকের গুলি বাঘের গায়ে না লেগে যদি জিবার গায়ে লাগে?—এই ভয়ে ট্রিগার টিপতে সাহস পাচ্ছে না।

কিন্তু মুসা আর দেরি করল না। রাইফেল তুলে গুলি করেই সরে গেল।

এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল জিবা, মনে হলো গুলিটা সে-ই খেয়েছে।

গর্জে উঠল জাগুয়ার। মুখ ফিরিয়ে তাকাল। নতুন শত্রুদের দেখে আরেকবার গর্জন করে লাফ দিল পনেরো ফুট ওপর থেকে। চোখের পলকে এসে পড়ল মুহূর্ত

আগে মুসা যেখানে ছিল সেখানে।

জাওয়ারের একেবারে গায়ে নল ঠেকিয়ে গুলি করল কিশোর।

কাত হয়ে পড়ে গেল জীবটা। পরক্ষণেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। যেন কিছুই হয়নি।

আবার গুলি করল মুসা। তাড়াহুড়োয় মিস করল।

গুলি করল কিশোর। পড়ে গিয়ে আবার উঠল জাওয়ার। মুখে রক্ত। গর্জাচ্ছে। বাতাসের সঙ্গে নাক দিয়ে রক্তের ছিটে বেরোচ্ছে, মুখের কষেও রক্ত। কিন্তু থামল না। শাঁই শাঁই দুই থাবা চালাতে চালাতে ছুটে এল। মস্ত হাঁ, রক্তে মাখামাখি হয়ে যাওয়ায় বিকট দেখাচ্ছে।

বন্দুকের দুটো নলই খালি। বোকার মত হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোর।

গুলির পর গুলি করে চলেছে মুসা। কিন্তু বাঘের গায়ে লাগছে বলে মনে হলো না।

আর কিছু না পেয়ে একটা বাঁশের টুকরো তুলে নিয়ে ধাঁ করে বাঘের পিঠে বসিয়ে দিল রবিন। ঘুরে তাকে ধরতে গেল জানোয়ারটা।

ভয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল ইনডিয়ানরা। কিন্তু মিরাটো গেল না। বল্লম নিয়ে সাহায্য করতে এগোল তিন গোয়েন্দাকে। ইনডিয়ানদের বাঘ মারার বিশেষ বল্লম, দুই দিকেই ফলা।

ভয়ানক গর্জন করে, মুখ দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছিটিয়ে নতুন শত্রুকে সই করে লাফ দিল বাঘ। শাঁ করে পাশে সরে বল্লম বাড়িয়ে দিল মিরাটো। বাঘের বুক ছেঁদা করে ঢুকে গেল চোখা ফলা।

তাতেও থামল না দানব। ঝাড়া দিয়ে বুক থেকে বল্লম খুলে ফেলে আবার লাফ দিল।

আবার বল্লম বাড়িয়ে দিল মিরাটো। বাঘের বুকে আবার গাঁথল বল্লম। বল্লমের আরেক ফলা মাটিতে ঠেকিয়ে ছেড়ে দিল সে, লাফিয়ে সরে এল।

চাপে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল বল্লম। কিন্তু খুলল না। সোজা হলো, বাঘের পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। এবার কাবু হয়ে এল জাওয়ার, কিন্তু থামল না। মিরাটোর গলা সই করে লাফ দিল, ধরতে পারলে এক কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে কণ্ঠনালী।

সরে গেল মিরাটো।

বুক-পিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে বল্লম, নড়াচড়া আর বেশি করতে পারছে না জাওয়ার। থাবা আটকে যাচ্ছে, বল্লমের জন্যে নড়াতে পারছে না।

বন্দুকে গুলি ভরে ফেলেছে আবার কিশোর। বাঘের হৃৎপিণ্ড সই করে গুলি করল।

পড়ে গেল জাওয়ার। তবু থামল না। এগোনোর চেষ্টা করল।

মাথায় গুলি করল মুসা।

এইবার শেষ হলো। লুটিয়ে পড়ল বাঘ।

কিন্তু জয়ের আনন্দে হাসতে পারল না কিশোর। তার মনে হলো, পরাজয়ই হয়েছে তাদের। জাগুয়ারকে জ্যান্ত ধরতে পারেনি।

আট

ইনডিয়ানরা জাগুয়ারের মাংসও খেলো। মুসা এক টুকরো মুখে দিয়েই ফেলে দিল। কেমন শক্ত শক্ত রবারের মত, দাঁত দিয়ে কাটতে কষ্ট হয়, বাজে স্বাদ। ইনডিয়ানরাও ভাল বলছে না, তবু খাচ্ছে। ওদের বিশ্বাস, এই মাংস খেলে জাগুয়ারের মতই সাহসী আর শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

সেদিন রাতে গর্তের ওপর আবার ফাঁস পেতে রাখা হলো।

কিন্তু জাগুয়ার এল না।

'ঠিক আছে,' পরদিন সকালে বলল কিশোর, 'বাঘ না এলে আমরাই বাঘের কাছে যাব।'

বেরিয়ে পড়ল সবাই।

বনের ভেতরে জাগুয়ারের পায়ের তাজা দাগ খুঁজে বের করল মিরাটো।

অনুসরণ করে চলে এল একটা পাহাড়ের গোড়ায়। একটা গুহার ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে ছাপ।

বন্দুক হাতে টিপে টিপে গুহামুখের কাছে পৌছল কিশোর। সাবধানে উঁকি দিল ভেতরে। অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ল না। কোন নড়াচড়া নেই, সাড়া নেই, এমনকি নিঃশ্বাসের শব্দও নেই। মাংশাসী জীবের গায়ের বোঁটকা তীব্র গন্ধ রয়েছে বাতাসে, তারমানে আছে জাগুয়ার। সুড়ঙ্গের অনেক ভেতরে।

সঙ্গে করে শক্ত জাল আনা হয়েছে, ম্যানিলা দড়ি দিয়ে তৈরি। গর্তের মুখে বিছিয়ে দেয়া হলো জাল।

চারপাশে খুঁটি গেঁথে তাতে আটকানো হলো এমনভাবে, উল্টোদিক থেকে যাতে সামান্য গুঁতো লাগলেই খুলে যায়।

জালের চার কোণায় চারটে লুপ রয়েছে, সেগুলোর ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হলো লম্বা মোটা একটা দড়ি। দড়ির দুটো প্রান্তই ঘুরিয়ে আনা হলো একটা গাছের ডালের ওপর দিয়ে।

জাল ঠেলে বেরোনোর চেষ্টা করবে জাগুয়ার। তাতে তার শরীরটা ঢুকে যাবে জালের মধ্যে। দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেই তখন জালের চারকোণা এক হয়ে যাবে, আটকা পড়বে জীবটা। শূন্যে টেনে তোলা হবে তখন ওটাকে, গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হবে, যতক্ষণ না তেজ কমে। তারপর খাঁচা এনে দরজা ওপরের দিকে করে জালসহ তার ভেতর নামিয়ে দেয়া হবে জাগুয়ারটাকে। দরজা বন্ধ করে জাল ছাড়ানোর ব্যবস্থা হবে, সেটা যেভাবেই হোক করা যাবে, পরের কথা পরে। আগে

তো ধরা পড়ুক।

সারাক্ষণই চারজন করে পাহারা রইল দড়ির মাথার কাছে। চার ঘণ্টা পর পর পাহারা বদল হলো।

সারাটা দিন অপেক্ষা করে আছে সবাই। জাগুয়ারের দেখা নেই। বেলা ডোবার সময় উত্তেজনা চরমে পৌঁছল। এই বুঝি নড়ে ওঠে জাল, মাথা দেখা যায়।

দিবাচরদের বাসায় ফেরার সময় হলো, জেগে উঠল নিশাচরেরা। ধীরে ধীরে শুরু হলো তাদের জারিগান, কিন্তু তার সঙ্গে সুর মেলাল না জাগুয়ার।

এতক্ষণ তো ভেতরে থাকার কথা নয়! হতাশ হলো কিশোর। নেই নাকি? না অন্য কোন মুখ আছে সুড়ঙ্গের, সেদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

গায়ে লাগছে সাঁঝের ফুরফুরে হাওয়া। পশ্চিম আকাশে রঙের খেলা। পাখি আর বানরের কিচির-মিচির কমতে কমতে থেমে গেল।

তবু মহারাজের দেখা নেই।

'এভাবে হবে না,' বলল মিরাটো।

'আর তো কোন উপায়ও দেখছি না,' হতাশা ঢাকতে পারল না কিশোর।

'আছে। উপায় আছে। চলো, নৌকায় চলো।'

বসে থাকতে থাকতে কিশোরেরও ভাল লাগছে না, উঠতে পেরে খুশিই হলো। সঙ্গে একজন ইনডিয়ানকে নিল মিরাটো। অন্যেরা বসে রইল দড়ির কাছে, মুসা আর রবিন সেখানেই থাকল। জালও পাহারা দেবে, ইনডিয়ানদেরও। ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই, সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেয়।

ছোট বজরার দড়ি খুলল মিরাটো। দাঁড় বেয়ে চলল দুই ইনডিয়ান। চুপচাপ পাটাতনে বসে রইল কিশোর।

মাঝ নদীতে এসে নৌকা থামাল। দাঁড় রেখে শিঙা মুখে লাগাল মিরাটো।

না হেসে পারল না কিশোর। বাঘের ডাক এত নিখুঁতভাবে বাঘও ডাকতে পারবে কিনা সন্দেহ।

'নদীর পানি কি শান্ত দেখছ,' এক সময় বলল মিরাটো। 'এমন রাতে সাঁতার কাটতে ভালবাসে টিগ্রে। মাছ ধরে। তখনই তাকে ধরতে সুবিধে। পানিতে জোর পায় না।'

বিরতি দিয়ে দিয়ে ডেকে চলল সে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরোল। নদীর খোলা বাতাসে শীত করছে কিশোরের। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। আগে ভাবত, বাঘ শিকারে সাংঘাতিক উত্তেজনা আর আনন্দ, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, বিরক্তিকরও বটে। আহ, হ্যামকে শুয়ে এখন গায়ের ওপর ভারি কম্বল টেনে দিতে পারলে...

'আসছে,' অনেক দূর থেকে যেন কানে এল মিরাটোর কণ্ঠ।

চোখ মেলল কিশোর। তীরের কাছে পানিতে মৃদু ছপছপ শোনা যাচ্ছে, আর কুমিরের কান্নার মত একটা শব্দ।

আবার ডাকল মিরাটো।

জবাব এল। কান্নার সঙ্গে কাশি মেশানো, মুখে পানি ঢোকায় অস্পষ্ট শোনাল আওয়াজটা।

বাঘ!

ঝট করে সোজা হলো কিশোর। ঘুম পালিয়েছে। ভাল করে তাকাল। তারার আলোয় আবছামত দেখা যাচ্ছে মাথাটা।

থামল ওটা, বাঘই, কোন সন্দেহ নেই। ছোট। এদিক ওদিক নড়ল, দ্বিধা করছে এগোতে। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছে, কোনদিকে আছে তার সাথী।

আস্তে আবার শিঙ্গায় ফুঁ দিল মিরাটো।

এগোতে শুরু করল আবার বাঘ।

উত্তেজনায় কাঁপছে কিশোর। কি করতে চাইছে তরুণ ইনডিয়ান?

নৌকার কিনারে চলে এল বাঘ। মাথাটা, আর লেজের খানিকটা পানির ওপরে, শরীর নিচে। ইচ্ছে করলে হাত বাড়িয়ে লেজ চেপে ধরা যায়, এত কাছে।

তা-ই করল মিরাটো। শিঙ্গা রেখে হঠাৎ বাঘের লেজ চেপে ধরল। টেনে তুলে ফেলল ওপর দিকে। ইনডিয়ান লোকটার নাম ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি ছোটো, জলদি।'

পাগলের মত দাঁড় বাইতে লাগল লোকটা।

নৌকা ছুটল। লেজ টেনে বাঘের পেছনের অনেকখানি পানির ওপরে তুলে ফেলেছে মিরাটো। মাথা ডুবে গেছে, তুলতেই পারছে না জানোয়ারটা। শ্বাসও নিতে পারছে না। অসহায় ভঙ্গিতে ছটফট করছে শুধু। লড়াই তো দূরের কথা, বেশিক্ষণ এই অবস্থা চললে দম বন্ধ হয়েই মরবে।

আস্তে আস্তে থেমে গেল বাঘের নড়াচড়া। ভেজা তুলোর বস্তা টেনে নিচ্ছে যেন এখন মিরাটো। দাঁড় বাওয়া থামাতে বলল।

নৌকায় তুলে নেয়া হলো বাঘটাকে। ছোট, বেশি ভারি না। যেটাকে সেদিন মারা হয়েছে, তার তুলনায় বাচ্চা।

জাল এনে তার ওপর শুইয়ে দেয়া হলো বাঘটাকে। নড়ছেও না। মরে গেল নাকি? সাবধানে বুকে হাত রাখল কিশোর। না, ধুকপুক করছে।

নড়ে উঠল বাঘ।

লাফিয়ে সরে এল কিশোর। 'মিরাটো, জলদি! জাল!'

দ্রুত জালের চার কোণ এক করে বেঁধে ফেলা হলো। হুঁশ ফিরেছে বাঘের। গোঁ গোঁ করছে আর জালের খোপ দিয়ে পা বের করে থাবা মারার চেষ্টা করছে। কিন্তু সুবিধে করতে পারল না, আটকা পড়েছে ভালমত। শূন্যে তুলে জালশুদ্ধ তাকে বাঁধা হলো মাস্তুলের সঙ্গে। ঝুলে থেকে বৃথাই অসহায় তর্জন-গর্জন চালাল টিগ্রে।

'সকালে আরেকটা খাঁচা বানাতে হবে,' বলল কিশোর।

'কেন? খাঁচা তো আছেই?' মিরাটো বলল।

'তা আছে। কিন্তু গুহার মুখে জালও পাতা আছে।' একটা ধরেছে, আরেকটা বাঘ ধরার লোভ ছাড়তে পারছে না কিশোর। বড় একটা।

ভোরের আলো ফুটল। কিন্তু সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বাঘ বেরোল না।

ঢুকে দেখবে নাকি?—ভাবল কিশোর। নাহ, বেশি ঝুঁকি হয়ে যাবে। কিন্তু একবার যখন মাথায় ঢুকেছে, কথাটা খোঁচাতে থাকল তাকে। শেষে উঠেই পড়ল। ঢুকবে, তারপর যা হয় হবে। গন্ধ আছে, বাঘ নেই, তাহলে গেল কোথায়? কোন রহস্যের সমাধান না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

সবাই বাধা দিল, ঠেকাতে পারল না। যাবেই সে। একটা বাঁশের টুকরোর মাথায় টর্চ বেঁধে হাতে নিল, আরেক হাতে মুসার বাবার পিস্তল। আশা, বাঘের প্রথম আঘাত আলো আর বাঁশের ওপর দিয়ে যাবে।

জালের এক কোণা তুলে সুড়ঙ্গে ঢুকল কিশোর।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ, কয়েক পা এগিয়েই বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। বাতাসে বাঘের গায়ের গন্ধ তীব্র। মোড় নিতেই চাপা গর্জন কানে এল। হঠাৎ শীত করতে লাগল কিশোরের। বোকামিই করে ফেলেছে!

বাঁশটা নেড়ে এখানে ওখানে আলো ফেলল। কিছুই নেই, শুধু দুটো আলোর গোলক।

আরেকবার গোঁ গোঁ শব্দ।

কিন্তু বাঘ কই? আলো দুটো যদি চোখ হয়, পেছনে তো শরীরটা থাকবে। হলদে-কালো রঙ কই?

টর্চের আলো নড়তেই আবার হলো গর্জন।

কিশোর জানে, কোন জানোয়ারই আক্রান্ত না হলে সহজে মানুষকে আক্রমণ করে না। এক পা-ও আর এগোল না সে, তাহলে নিজেকে কোণঠাসা ভেবে বসতে পারে জানোয়ারটা। তাড়াহুড়ো করে পিছিয়েও আসা যাবে না। তাহলেও লাফিয়ে এসে পড়তে পারে বাঘ। মোটকথা, এখন কোন ভাবেই চমকে দেয়া যাবে না ওটাকে।

ঢিবঢিব করছে বুকের ভেতর। কিশোরের ভয় হলো, তার হৃৎপিণ্ডের শব্দ চমকে দেবে বাঘটাকে।

আলো দুটো দেখা যাচ্ছে।

টর্চ নড়তেই আবার গর্জন। সামান্য আগে বাড়ল আলোদুটো।

এবার দেখল কিশোর। কুচকুচে কালো মুখ। কালো শরীর। বুকের খাঁচায় ধড়াস করে যেন আছাড় খেলো তার হৃৎপিণ্ডটা।

আমাজনের জঙ্গলের মহামূল্যবান সম্পদ, দুর্লভ কালো জাগুয়ার! যে কোন চিড়িয়াখানা লুফে নেবে, অনেক দামে।

পিস্তল উদ্যত রেখেছে কিশোর, কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে না, জানে। করলে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। পিস্তলের গুলি ঠেকাতে পারবে না ওটাকে,

মাঝখান থেকে জানোয়ারটাকেও হারাবে, তার নিজেরও প্রাণ যেতে পারে।

খুব সাবধানে পিছাতে শুরু করল কিশোর। একটা পাথরের সঙ্গে হোঁচট লাগল, উল্টে পড়তে পড়তে সামলে নিল কোনমতে। ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে, ভড়কে গেছে জাগুয়ার। লাফিয়ে এসে পড়ল। থাবার প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হয়ে গেল বাঁশটা, টর্চ ভেঙে নিভে গেল।

বাঁশ ফেলে দিয়ে ঘুরে দৌড় দিল কিশোর। উন্মাদের মত ছুটে এসে পড়ল গুহামুখের জালে। ঠেলার চোটে কোণগুলো ছুটল ঠিকই, সে জড়িয়ে গেল জালে। পেছনে কালো জাগুয়ারের ভীমগর্জন। রাগিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে লোকজন। তাদের হাতের দড়িতে টান পড়ল। ধরেই নিল তারা, জালে বাঘ পড়েছে। হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেলল কয়েক ফুট। ভারি লাগছে। শিকার যে পড়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। টেনে আরও ওপরে তুলে ফেলল জাল।

আড়ালে বসেছে, গুহামুখটা দেখা যায় না। কিন্তু জালটা ওপরে উঠতেই দেখা গেল। সবার আগে দেখতে পেল মুসা। চোখ বড় বড়, হাঁ হয়ে গেল মুখ, কথা ফুটছে না। এ-কি! হেসে উঠল হো হো করে। রবিন হাসল। হেসে ফেলল ইনডিয়ানরাও। হাসির হুল্লোড় উঠল।

শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে বার দুই ধমক দিল জাগুয়ার। আবার ঘরে ঢুকলে দেখাবে মজা, বোধহয় এটাই শাসিয়ে ফিরে গেল সুড়ঙ্গে।

জালে ঝুলছে গোয়েন্দাপ্রধান। মাথা নিচে, ঠ্যাঙ ওপরে, জালের খোপ দিয়ে বেরিয়ে ঝুলছে দুই হাত। এর চেয়ে মজার দৃশ্য আর আছে। হাসতে হাসতে মাটিতে শুয়ে পড়ল মুসা, পেট চেপে ধরে পা ছুঁড়ছে।

রবিনেরও মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়, চোখে পানি এসে গেছে। কিন্তু হাসি থামাতে পারছে না। তাতে সুড়সুড়ি দিচ্ছে মুসার হাসি, আরও বেশি হাসি আসছে।

'হাসির কি হলো?' ধমক দিল কিশোর, গলায় জোর নেই। 'নামাও। জলদি নামাও···রাখো রাখো, আগে দেখো গুহার মুখে বাঘটা আছে কিনা।'

বাঘ নেই দেখে জাল নামানো হলো। বেরিয়ে এল কিশোর।

'হোওহ্-হোহ্ হা-হা!' হাসি থামছে না মুসার। 'দা গ্রেট টাইগার ম্যান! বাঘ ধরতে গুহায় ঢুকেছে! হা-হা-হা!'

হাসছে রবিন।

'রবিন, ইসুসি, কি একখান মওকা গেল!' হাসতে হাসতে বলল মুসা, 'তোমার ক্যামেরাটা থাকলে···ওই ছবি ইস্কুলে ভাড়া দিতে পারতাম···হো হো-হো!'

নয়

আলোচনা-সভা বসল কি করে ধরা যায় কালো জাগুয়ার?

একেকজন একেক কথা বলল।

'ধরতেই হবে ওটাকে,' ঘোষণা করল কিশোর। 'সুন্দরবনের বাঘও এত দামী নয়।'

'কিন্তু কিভাবে?' প্রশ্ন রাখল মুসা।

'গতকাল থেকেই তো চেষ্টা হচ্ছে,' রবিন বলল, 'ফাঁদে তো পা দিল না। ব্যাটা খুব চালাক।'

একটা কথাও বলছে না মিরাটো। একমনে কাজ করে যাচ্ছে চুপচাপ। রুটিফল গাছের রস দিয়ে আঠা তৈরি করছে, খুব ঘন।

ইনডিয়ানরা পাখি ধরতে ব্যবহার করে এই আঠা। যেখানে সব সময় পাখি বসে গাছের সে-ডালে আঠা মাখিয়ে রাখে। বসলে আর উঠতে পারে না পাখি, পা আটকে যায়। ছোটার জন্যে ছটফট করে, পাখায় লাগে আঠা, ডানা জড়িয়ে যায়। উড়তেও পারে না। ধরা পড়ে শিকারীর হাতে।

পাখি ধরার জন্যেই আঠা বানাচ্ছে মিরাটো। দুপুরে পাখির মাংসের রোস্ট খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে।

বানাতে বানাতেই থমকে গেল সে, মুখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে। মাথায় একটা ফন্দি এসেছে। আঠা দেখিয়ে বলল, 'এ-জিনিস দিয়েই বাঘ ধরব।'

হেসে উঠল কিশোর। 'পাখি-আর বানর ধরতে পারবে, তা ঠিক। বাঘ ধরতে পারবে না, অন্তত এই আঠা দিয়ে নয়।'

'বাঘই ধরব,' চ্যালেঞ্জ করে বসল মিরাটো। 'আমার দাদা নাকি একবার ধরেছিল।' সঙ্গী ইনডিয়ানদের সাক্ষি মানল, 'কি মিয়া, ধরেনি? শুনেছ না?'

মাথা নাড়ল ইনডিয়ানরা, শুনেছে।

বিশ্বাস হলো না কিশোরের। তবু মিরাটো যখন বলছে…

'ঠিক আছে,' মাথা কাত করল সে। 'পারলে ধরো। আমার কথা হলো, ধরা চাই। পালিয়ে যেতে দেয়া চলবে না।'

পাখি ধরা চুলোয় গেল, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মিরাটো। উত্তেজিত কথার ফুলঝুরি ছোটাল সঙ্গীদের দিকে চেয়ে। ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেল। জোগাড় করে আনল আরও আঠা।

গুহা থেকে বেরিয়ে কোনদিকে যায়, বাঘ চলাচলের সে-পথটা খুঁজে বের করল। ভালমত দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল, তারপর গুহার কয়েকশো ফুট দূরে ফাঁদ পাতল।

গুহামুখে যে জালটা পাতা হয়েছিল, সেটা খুলে এনে বিছাল বাঘ চলাচলের পথে। পাতা দিয়ে ঢেকে দিল, যাতে দেখা না যায়। তার ওপর পুরু করে ফেলল

আঠা। সেই আঠার ওপর আবার পাতা ছড়িয়ে দিল।

'ব্যস,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল মিরাটো। 'এবার শুধু চুপ করে বসে থাকা।'

অপেক্ষা আর অপেক্ষা। কত আর বসে থাকা যায়? ক্যাম্প থেকে হ্যামকগুলো সরিয়ে আনা হলো ফাঁদের কাছে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে গাছে ঝুলিয়ে শুয়ে পড়ল তাতে তিন গোয়েন্দা। বাকি দিনটা পড়ে পড়ে ঘুমাল।

বাঘ এল না।

রাতে সবাই ঘুমাল, পালা করে পাহারা দিল।

বাঘের পথ, গন্ধে ও-পথে এল না কোন জানোয়ার। বাঘও এল না। ভোরের দিকে ভুল করেই যেন এসে পড়ল ছোট একটা জীব। ইঁদুর গোষ্ঠীর দুই ফুট লম্বা প্রাণী, অ্যাগুটি। আঠার ফাঁদে আটকা পড়ল।

'ধাত্তোর!' বিরক্ত হয়ে হ্যামক থেকে নামতে গেল কিশোর, প্রাণীটাকে ছাড়ানোর জন্যে।

'রাখো, রাখো,' বাধা দিল মিরাটো। 'ভালই হয়েছে। থাক ওটা। ওটার গন্ধেই টিগ্রে আসবে।'

বলতে না বলতেই বাঘের চাপা গর্জন শোনা গেল। ঝট করে ঘুরে তাকাল দু-জনে।

গুহামুখে বাঘের মাথা।

নিকষ কালো। উজ্জ্বল হলুদ চোখ। অল্প ফাঁক হয়ে আছে মুখ, ঝকঝকে ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। ইনডিয়ানরা যে বলে : *কালো জাগুয়ার বাঘের মধ্যে সব চেয়ে হিংস্র,* বোধহয় ঠিকই বলে, দেখে তা-ই মনে হচ্ছে কিশোরের।

গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে বসল বাঘ। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকেছে গুহার ভেতরে, নিশ্চয় তৃষ্ণা পেয়েছে, নদীতে পানি খেতে যাবে। তার আগে ভালমত দেখে নিচ্ছে আশপাশটা। চলার পথে এখন যে জানোয়ার পড়বে তার কপালে খারাপী আছে।

ঘন বনে ঢোকার জন্যে পা বাড়াল কিশোর।

হাত চেপে ধরল মিরাটো। 'না, আমাদের পিছু নিতে পারে। ফাঁদ থেকে দূরে সরে যাবে তাহলে।'

মুসা আর রবিনের ঘুম ভাঙেনি, অন্য ইনডিয়ানরাও ঘুমিয়ে আছে।

কিশোরকে টেনে নিয়ে দৌড় দিল মিরাটো। বাঘ চলার পথ ধরে ছুটল নদীর দিকে। এখন ফাঁদটা রয়েছে বাঘ আর তাদের মধ্যে। অ্যাগুটির মতই ওরাও বাঘের টোপ হয়ে গেছে।

পেছনে ফিরে তাকাল একবার কিশোর, রওনা হয়েছে বাঘ। সাপের মত নিঃশব্দ মসৃণ গতি। চকচকে ওই কালো চামড়ার তলায় অন্তত দু-শো কেজি হাড়-মাংস-রক্ত রয়েছে, অনুমান করল সে। এত ভারি শরীর নিয়ে ওভাবে চলে কি করে!

অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। ভয় লাগছে। যদি মিরাটোর কৌশল বিফল হয়? সাধারণ ওই আঠা আটকাতে পারবে এত শক্তিশালী একটা জানোয়ারকে!

গতি বাড়ছে জাগুয়ারের। দৌড়ে রূপ নিচ্ছে হাঁটা। পা ফেলার তালে তালে এমনভাবে নড়ছে আর কাঁপছে কাঁধের পেশী, মনে হয় যেন পিস্টন চলছে তলায়। তাকালে দৃষ্টি আটকে যায়।

তা-ই গেছে কিশোর আর মিরাটোর। দাঁড়িয়ে দেখছে।

অ্যাগুটির দিকে তাকাচ্ছে না কেন?—ভাবছে কিশোর। খালি আমাদের দিকে চোখ। বোকা হয়ে গেল যেন সে। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে বাঘের দিকে, গায়ে এসে লাফিয়ে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে যেন।

চাপা গোঁ গোঁ করল জাগুয়ার। হঠাৎ বন কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল। জালের কাছাকাছি এসে পড়েছে। অ্যাগুটির ওপর চোখ পড়তেই যেন ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল আস্তে আস্তে, মাটির সঙ্গে পেট মিশিয়ে ফেলল। চামড়ার তলায় থিরথির করে কাঁপছে মাংসপেশী, দেখা যাচ্ছে। নড়ছে লেজটা, বাড়ি মারছে মাটিতে।

অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত গতিতে লাফ দিল।

একলাফে বারো ফুট পেরিয়ে এসে পড়ল অ্যাগুটির ওপর। ঘাড় কামড়ে ধরল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিল আবার। পায়ের তলার আঠা নজর কেড়েছে।

এইবার দেখা যাবে—ভাবল কিশোর—মিরাটোর আঠা কতখানি কাজের? কত শক্ত? সামনের এক পা তুলছে বাঘ। তুলে ফেলল, আঠায় আটকে রইল না। থাবা সাদা আঠায় মাখামাখি। আরেক পা তুলে অবাক হয়ে দেখল, একই জিনিস লেগে রয়েছে।

আর দেখার ইচ্ছে নেই কিশোরের। চেঁচিয়ে বলল, 'চলো, ভাগি! আঠায় আটকাবে না।'

কিশোরের বাহু খামচে ধরল মিরাটো। 'দাঁড়াও! দেখো।'

চেটে আঠা ছাড়ানোর চেষ্টা করল বাঘ। পারল না। রাগে কামড় মারল থাবায়। ফল হলো আরও খারাপ, মুখেও লেগে গেল আঠা। ডলে মুখ থেকে ছাড়াতে গিয়ে লাগল চোখের আশেপাশে। আঠা ছাড়ানোর চেষ্টায় শুয়ে পড়ল সে, লাগল পেটে। পাগল হয়ে গেল যেন। যতই ছাড়ানোর চেষ্টা করে, আরও বেশি করে লাগে।

এতক্ষণে বুঝল কিশোর ঘটনাটা। তার এক নানী—মেরি-চাচীর মা—বলেন, বেড়ালকে ব্যস্ত রাখতে চাইলে তার পায়ে ভালমত মাখন মাখিয়ে দাও। ওই মাখন ছাড়াতেই হিমশিম খেয়ে যাবে সে, তোমাকে বিরক্ত করবে কখন?

জাগুয়ারও বেড়ালের জাত, পরিষ্কার থাকতে পছন্দ করে, আঠা ছাড়ানোর ব্যস্ততায় তাই মানুষ আর অ্যাগুটির কথা ভুলে গেল বেমালুম।

মুসা, রবিন আর ইনডিয়ানরা জেগে গেছে। কি হচ্ছে দেখতে এল। জাগুয়ারের এক চোখ পাতায় ঢেকে গেছে, আরেক চোখে আঠা, ফাঁক দিয়ে আবছামত দেখতে পেল মানুষগুলোকে। চাপা গর্জন করে ধমক লাগাল, এগোতে মানা করছে। তারপর আবার আঠা পরিষ্কারে মন দিল। বেড়ালের মতই পেছনের পায়ের ওপর

বসে লম্বা জিভ বের করে চাটছে শরীরের এখানে ওখানে।

'এবার ধরা যায়,' বলল মিরাটো।

ইনডিয়ানদেরকে খাঁচাটা আনতে বলল সে।

খাঁচা এলে, জালের দড়ি দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে পেছনের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে টেনে বের করল। দড়ি ধরে আস্তে টানতেই টান পড়ল জালের কোণের চারটে লুপে। অন্যেরাও এসে হাত লাগাল তার সঙ্গে।

'আস্তে,' হুঁশিয়ার করল মিরাটো। 'আরও আস্তে।'

জালের আলতো টান লাগল বাঘের পেছন দিকটায়। সামান্য এগিয়ে বসল ওটা, আঠা চাটার বিরাম নেই। আবার টান লাগলে আরেকটু এগিয়ে বসল। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এভাবে নিজের অজান্তেই এগিয়ে আসতে লাগল খাঁচার দিকে।

দরজার ভেতরে বাঘের শরীর অর্ধেক ঢুকে যেতেই জোরে টানল মিরাটো। জালের পেছনের দুটো কোণ উঠে এল জাগুয়ারের কাঁধের ওপর, আরেকবার টানতেই খাঁচায় ঢুকে পড়ল ওটা। ফিরে না চেয়ে জোরে ধমক দিল একবার। যেন বলল, 'উঁহ, জ্বালাল দেখছি। আমি মরি আঠার যন্ত্রণায়। এই চুপ থাকো, নইলে দেখাব মজা।' আবার আঠা পরিষ্কার করতে লাগল।

বন্ধ করে দেয়া হলো খাঁচার দরজা। ফিরে তাকাল জাগুয়ার, দরজার বাঁশে বার দুই আলতো থাবা মেরে আবার আগের কাজে লাগল।

'হপ্তাখানেক ধরে চলবে এখন,' হাসছে মিরাটো। 'এক বিন্দু আঠা গায়ে থাকলেও থামবে না। চাটতেই থাকবে, চাটতেই থাকবে।'

তাজ্জব হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। এত সহজে ধরে ফেলল বাঘটাকে? বিশ্বাস হচ্ছে না তাদের।

এরপর খাঁচাটা নদীর পারে নেয়ার পালা। বিশেষ বেগ পেতে হলো না। কয়েকটা বাঁশের টুকরোর ওপর দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসা হলো ওটা, বাঁশের টুকরো চাকার মত গড়ায়, তার ওপর দিয়ে খাঁচা চলে। জনবল মন্দ নয়, বজরায় তোলাও খুব একটা কঠিন হলো না। কাজটা আরও সহজ হয়েছে জাগুয়ারটা কোন রকম বাধা না দেয়ায়। সে আছে তার কাজে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে শুধু ঘড়ঘড় করে হুঁশিয়ার করেছে, ব্যস।

ছোট হলুদ জাগুয়ারটার নাম রাখা হলো মিস ইয়েলো, আর কালোটার নাম মিস্টার ব্ল্যাক, ডাক নাম 'বিগ ব্ল্যাক'।

'তোমার দোস্ত,' মুচকি হেসে মুসাকে বলল কিশোর। 'চেহারা-সুরতে অনেক মিল।'

'যত যা-ই বলো,' দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার, 'তোমার ওই জালে আটকানোর তুলনা হয় না।' কথাটা মনে পড়ায় আবার হাসতে শুরু করল সে।

রবিন হাসল।

কিশোরও হাসল এবার। তার আনন্দ বাগ মানছে না। একই দিনে দু-দুটো জাগুয়ার, তার একটা আবার দুর্লভ কালো চিতা। সবাইকে ধন্যবাদ জানাল সে,

এমনকি জিবাকেও, যে জাগুয়ার ধরায় কোন সাহায্যই করেনি।

আর একটিমাত্র প্রাণী ধরতে পারলেই পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয় কিশোর, অ্যানাকোণ্ডা। তবে তার পরেও অনেক কাজ বাকি থাকে—ভ্যাম্পের চোখ এড়িয়ে নদীর ভাটিতে গিয়ে কোন শহরে থেমে স্টীমার ধরা, তারপর বাড়ি ফেরা। কঠিন এবং ঝুঁকির কাজ।

দশ

এগিয়ে চলেছে বজরা-বহর।

পেরিয়ে এল আরও দু-শো মাইল। ইতিমধ্যে আরও কিছু প্রাণী ধরেছে ওরা—একটা শ্লথ, একটা আরমাডিলো, আর এক জাতের খুদে, খুব সুন্দর একটা আমাজন হরিণ। কিন্তু যার জন্যে বেশি আগ্রহ, সেই অ্যানাকোণ্ডারই দেখা পাওয়া গেল না।

একদিন, রাত কাটানোর জন্যে একটা বড় খালে ঢুকল বজরা। এতদিন যেসব খাল দেখেছে, এটা সেরকম নয়। ঝকঝকে বালির চরা নেই। দুই পাড়েই ঘন ঘাস আর কাশবন। খালের পানিতেও নানারকম জলজ তৃণলতা জন্মে আছে।

মিরাটো বলল, এখানে অ্যানাকোণ্ডা না থেকে যায় না।

রাতটা কাটল।

সকালে জন্তু-জানোয়ারের তদারকিতে লাগল মুসা আর কিশোর।

আইবিস পাখিটা গায়েব। যেখানে ছিল, সেখানে এখন পড়ে রয়েছে কয়েকটা পালক। খাঁচাটা চুরমার। ওই কাজ আইবিসের নয়, সে পারবে না। করেছে ভারি, শক্তিশালী কেউ। মাংসাশী জানোয়ারগুলোর দিকে একে একে তাকাল কিশোর, কার চোখে চোরা চাহনি আছে, খুঁজল। চোখ মুদে আরামে রোদ পোহাচ্ছে ডাইনোসর। তার ক্ষমতা আছে খাঁচা ভেঙে আইবিস বের করে খাওয়ার, কিন্তু গলার দড়ি এত খাটো, খাঁচার কাছেই যেতে পারে না। না, সে নয়। একটিমাত্র চোখ খোলা রেখে চেয়ে আছে লম্বু-বগা, নিষ্পাপ চাহনী। না, তার কাজও নয়। ইঁদুর, ব্যাঙ আর মাছ খেয়েই কূল করতে পারে না, রাতে চুরি করে খাঁচা ভেঙে স্বজাতী খাওয়ার কষ্ট করতে যাবে কোন দুঃখে।

বোয়ার গায়ে খাঁচা ভাঙার মত জোর আছে, পাখির মাংসেও অরুচি নেই। কিন্তু সে রয়েছে অন্য নৌকায়। পেটের শুয়োর এখনও পুরোপুরি হজম হয়নি, তাছাড়া পানিকে তার অপছন্দ। নাহ, সে-ও নয়।

তাহলে?

বেশি ভাবার সময় পেল না কিশোর। খাঁচার ভেতরে চেঁচামেচি জুড়েছে রক্তচাটা, খাবার চায়।

বোতলে ভরা আছে ক্যাপিবারার রক্ত। ঠাণ্ডা। সেটা আবার রুচবে না বাদুড়টার, গরম চাই, উষ্ণ রক্ত। তাজা না হলেও চলে, কিন্তু গরম হতেই হবে,

ধমনীতে প্রবাহিত হওয়ার সময় যতখানি গরম থাকে ততখানি।

একটা পাত্রে এক কাপ রক্ত ঢেলে চুলায় বসাল কিশোর। দেশলাইয়ের কাঠি জেলে আগুন ধরাতে গিয়ে চোখে পড়ল ব্যাপারটা। টলডোর নলখাগড়ায় তৈরি বেড়ায় মস্ত এক গোল ফোকর। কৌতূহল হলো তার। ভালমত দেখার জন্যে এগোল।

কিসে করল এই ছিদ্র, আগের দিনও ছিল না ওটা। রাতে করা হয়েছে। আইবিসের খাঁচা ভাঙা, পাখি গায়েব, পড়ে থাকা কিছু পালক, তারপর এই ফোকর...চকিতে মনে হলো তার—অ্যানাকোণ্ডা নয়তো?

রাতে হয়তো নৌকায় উঠেছিল, পাখিটাকে খেয়ে ওদিক দিয়ে পথ করে বেরিয়ে গেছে।

হঠাৎ দুলে উঠল নৌকা। আরে, কি ব্যাপার? আমাজনে এত বড় ঢেউ উঠল, যে খাল বেয়ে এসে নৌকা দুলিয়ে দিয়েছে? নাকি ভূমিকম্প? দেখার জন্যে তাড়াতাড়ি টলডো থেকে বেরোল সে।

কই? ঢেউ-টেউ তো দেখা যাচ্ছে না। তীরের দিকে চেয়ে ভূমিকম্পের কোন লক্ষণও দেখল না।

প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি লাগল নৌকার তলায়, কিসে যেন ঠেলা দিয়ে তুলে কাত করে ফেলেছে একপাশে। তাল সামলাতে না পেরে ডেকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর।

আবার সোজা হয়ে গেল নৌকা।

উঠে কিনারা দিয়ে তাকাল। পানিতে ভয়ানক তোলপাড়।

'অ্যানাকোণ্ডা!' কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মিরাটো, কণ্ঠ কাঁপছে। 'নৌকার তলায় বাসা।'

চেঁচাতে শুরু করেছে জিবা, লোকজনদের তৈরি হতে বলছে। 'এখুনি চলে যেতে হবে এখান থেকে। অ্যানাকোণ্ডা খুব খারাপ। দুষ্ট প্রেত।'

এমনিতেই ইনডিয়ানরা সাংঘাতিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাদের মনে আরও বেশি ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছে জিবা।

'যাচ্ছেটা কে?' জিবার কথার প্রতিবাদ করল কিশোর। 'সবাই শুনে রাখো, অ্যানাকোণ্ডা ধরার আগে নড়ছি না এখান থেকে। যার থাকতে ইচ্ছে করবে না, চলে যেতে পারো, বাধা নেই।'

কিন্তু সে-আগ্রহ দেখা গেল না কারও মধ্যে।

মিরাটোর সঙ্গে আলোচনায় বসল তিন গোয়েন্দা। কি ভাবে সাপ ধরবে, ধরে কোথায় রাখবে, এসব আলোচনা।

'খাঁচা তো লাগবেই,' মিরাটো বলল। 'পানি রাখার বড় পাত্রও লাগবে। একনাগাড়ে বেশিক্ষণ পানি ছাড়া থাকতে পারে না অ্যানাকোণ্ডা।'

সেটা জানে কিশোর। বিশাল ওই সাপগুলোকে অনেকে এজন্যে জলজ-সাপ বলে। 'কিন্তু এত বড় পাত্র কোথায়? রাখটার দরকার।'

'বানিয়ে নেব। গাছের ছাল দিয়ে।'

মিরাটোর ওপর এখন অগাধ ভক্তি আর বিশ্বাস কিশোরের। কি করে বানাবে, জানতে চাইল না। বলল, 'তাহলে চলো বানিয়ে ফেলি।'

তীরে নামল সবাই।

বড় সোজা একটা গাছ বেছে বের করল মিরাটো। পাল্পলহার্ট জাতের বিশাল গাছ, ছাল বেশ মোটা কিন্তু নরম, কাঠ থেকে সহজেই ছাড়িয়ে আনা যায়। গোড়ার কাছে গোল করে কাটল মিরাটো, বিশ ফুট ওপরে আবার চারদিকে ঘিরে গোল করে কাটল। ওপরের কাটা থেকে নিচের কাটা পর্যন্ত সোজা চিরে ফেলল। তারপর নিচের কাটা জায়গা ধরে টেনে ছাড়িয়ে নিল আস্ত ছালটা। বিশ ফুট লম্বা আর দশ ফুট চওড়া একটা ছালের চাদর বেরোল। কলাগাছের আস্ত খোল কেটে দুই ভাঁজ করে মিশিয়ে, বেঁধে, পাত্র তৈরি করে তাতে শিং মাগুর জিয়ল এসব মাছ রাখে জেলেরা। ছালটা দিয়ে নিচের দিকে চ্যাপ্টা, ওপরের দিকে গোল ওরকমই একটা বিশাল পাত্র বানানো হলো। বাঁধা হলো লিয়ানা লতা দিয়ে। দুই ধারেই লম্বা লম্বা দুটো ফাঁক, পানি চোয়াবে সেখান দিয়ে। তাই রবার গাছের আঠা পুরু করে লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো ফাঁক। ব্যস, চমৎকার বাথটাব তৈরি হয়ে গেল, পানি রাখলে পড়বে না।

এরপর একটা খাঁচা তৈরির কাজে লাগল সবাই।

গাধার মত খেটেও খাঁচা বানিয়ে তাতে বাথটাব বসিয়ে বাঁধতে বাঁধতে পরদিন দুপুর হয়ে গেল। রাতে পাহারা রাখা হলো, যাতে অ্যানাকোণ্ডা এসে আর কোন জানোয়ার চুরি করে নিতে না পারে।

খাঁচা তৈরি শেষ। এবার ফাঁদ পাততে হবে।

বড় বজরার মাস্তুলে একটা দড়ি বেঁধে আরেক মাথা নিয়ে যাওয়া হলো তীরে। চল্লিশ ফুট দূরের একটা গাছের দো-ডালার জোড়ার ওপর দিয়ে দড়িটা পেঁচিয়ে এনে অন্য মাথায় বাঁধা হলো আমাজন হরিণটাকে। ফাঁস তৈরি করা হলো তিনটা, একটা অ্যানাকোণ্ডার গলায় আটকানোর জন্যে, আর দুটো লেজে।

সব তৈরি। এবার সাপ এলেই হয়।

ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে বসল শিকারীরা। আবার সেই অপেক্ষার পালা। অনড় বসে থাকা আর থাকা।

গড়িয়ে গেল দিন।

পানির কিনারে সারাক্ষণ চরল হরিণটা, তাজা ঘাস ছিঁড়ে খেল। পিপাসা পেলে পানি তো আছেই। খুব সুন্দর একটা জীব। চকচকে চামড়া যেন ট্যান করা, বড় বড় বাদামী চোখ, ডালপাতাওয়ালা দেখার মত শিং। ওটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে মন খুঁতখুঁত করছে কিশোরের, কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। হরিণ খুবই পছন্দ অ্যানাকোণ্ডার, 'ডিয়ার সোয়ালোয়ার' বা হরিণখেকো ডাকনামই হয়ে গেছে এ-কারণে। আরেকটা হরিণ ধরে আনা, সময়ের ব্যাপার।

তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না কিশোরের।

সত্যি আছে তো এখানে সাপ? বজরার তলায় আসলেই অ্যানাকোণ্ডার বাসা আছে, নাকি ভুল করেছে মিরাটো? অ্যানাকোণ্ডার বাসা দেখতে কেমন? কৌতূহল মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রহস্যভেদীর মনে। বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এল, আর থাকতে পারল না কিশোর। মুসাকে বলল, 'চলো।'

'কোথায়?'

'অ্যানাকোণ্ডার বাসা দেখব।'

'ওই পানির তলায় ডুব দিয়ে?' দুই হাত নাড়ল মুসা। 'আমি পারব না, বাবা। আমার সাহসে কুলাবে না।'

মুচকি হাসল মিরাটো। 'চলো, আমি যাচ্ছি।'

পানিতে নামল দু-জনে। ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাড়। গলা পানিতে নেমে ডুব দিল কিশোর, পাশে মিরাটো। পানি স্বচ্ছ নয়, আবার ঘোলাও না। কয়েক হাতের বেশি দৃষ্টি চলে না। আচ্ছা, পিরানহা নেই তো? আশা করল সে, নেই। জলজ আগাছার মধ্যে ওই মাছের ঝাঁক না থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

পানির তলায় তাকিয়ে অ্যানাকোণ্ডার বাসা খুঁজল কিশোর।

আজব এক জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে মনে হলো। লম্বা লম্বা লতা, দুলছে। নলখাগড়ার মত এক জাতের ঘাস জন্মে রয়েছে গুচ্ছে গুচ্ছে। পিচ্ছিল, কেমন যেন গা শিরশির করা ওগুলোর ছোঁয়া। কোথাও সোজা কোথাও আড়াআড়ি, একটার ওপর আরেকটা পড়ে আছে মোটা ডাল ও ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছের কাণ্ড, কালো কালো। দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয়। ওগুলোর মাঝে ফাঁক এত কম, অ্যানাকোণ্ডার মত বড় প্রাণী থাকতে পারবে না।

দম নেয়ার জন্যে ভাসল কিশোর। তার পাশে মিরাটো। বুক ভরে বাতাস টেনে আবার ডুব দিল। আরও কয়েক হাত এগিয়ে কালো একটা গুহামুখ চোখে পড়ল। মুখটা পানির তলায়, সুড়ঙ্গটা গিয়ে শেষ হয়েছে তীরের কোন শুকনো গুহায়, আন্দাজ করল কিশোর।

ওটা যে সাপের বাসা, তার প্রমাণ মিলল। ফুট পাঁচেক লম্বা দুটো সাপ বেরিয়ে এঁকেবেঁকে ঢুকে গেল নলখাগড়ার জঙ্গলে।

তারপরই দেখা গেল বিশাল আরেকটা মাথা, গুহা থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোল কিশোরের দিকে। ধক করে উঠল তার হৃৎপিণ্ড।

হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল মিরাটো, ওপরে ওঠার জন্যে। কিন্তু তার আগেই ওঠার জন্যে ঘুরতে শুরু করেছে কিশোর। জোরে জোরে হাত-পা ছুঁড়ছে। ভয়, এই বুঝি এসে পা কামড়ে ধরল অ্যানাকোণ্ডা। টেনে নিয়ে যাবে অন্ধকার গুহায়। চিপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে রসিয়ে রসিয়ে গিলবে।

তার মনে হলো, পানির ওপরে বুঝি আর ওঠা হবে কোন দিনই।

ওপরে মাথা তুলে, সাঁতরে কিভাবে যে তীরে এসে উঠল, বলতে পারবে না সে। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে ধপ করে বসল ঝোপের কিনারে।

'কী!' একসঙ্গে প্রশ্ন করল মুসা আর রবিন।

'অ্যানাকোণ্ডা···মনে হয় তার বাড়ির ওপরই বসে আছি আমরা···পানির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ চলে এসেছে ডাঙায়।'

আবার অপেক্ষা।

অনেক সময় পেরোল। ঝোপের ভেতরই শুয়ে ঘুমাচ্ছে মুসা। রবিন ঢুলছে।

কিশোরের চোখেও ঘুম। একবার পাতা মেলছে, একবার বন্ধ। দেখার কিছু নেই। হরিণটা ঘাস খাচ্ছে, তার পায়ের কাছ থেকে খানিক দূরে ছোট ছোট ঢেউ ছপছপ করছে পাড়ে বাড়ি খেয়ে।

ছপছপ কিছুটা বাড়ল মনে হলো না? চোখ মেলল কিশোর। হরিণটার জন্যে প্রথমে চোখে পড়ল না, তারপর দেখল ওটাকে। নড়ছে। সাবমেরিনের পেরিস্কোপের মত। পলকে ঘুম দূর হয়ে গেল। অ্যানাকোণ্ডা আসছে, কোন সন্দেহ নেই। ডাঙার চেয়ে পানিতে থাকে বেশিক্ষণ ওই সাপ, তাই পানিতে থাকার মত করেই তৈরি হয়েছে শরীর। নাকটা ওপর দিকে ঠেলে তোলা, পুরো মাথাটা পানির তলায় থাকলেও ফুটো দুটো ওপরে থাকে, শ্বাস নিতে অসুবিধে হয় না।

ঢেউয়ের তলা থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে চোখ দুটো। এমনভাবে বসানো: ওপরে, নিচে, সামনে, পাশে সব দিকেই দেখতে পায় অ্যানাকোণ্ডা, আর কোন সাপের এই সুবিধে নেই। দুই চোখের মাঝের দূরত্ব দেখেই অনুমান করতে পারল কিশোর, সাপটা বিরাট।

হরিণের দিকে এগিয়ে আসছে জীবন্ত পেরিস্কোপ। পেছনে অনেক দূর পর্যন্ত পানিতে আলোড়ন, মস্ত প্রপেলার চলছে যেন পানির তলায়, পঁচিশ-তিরিশ ফুটের কম হবে না সাপটা।

নিঃশব্দে ঝোপ থেকে বেরিয়ে গাছের পেছনে চলে এল কিশোর। দড়ি ধরে টেনে সঙ্কেত দিল। মাস্তুলের গোড়ায় বসে পাহারা দিচ্ছে একজন ইনডিয়ান। সতর্ক হয়ে গেল সে।

তীরে ঠেকল অ্যানাকোণ্ডার থুতনি। বেয়ে উঠে আসতে শুরু করল। ঘাস খাওয়া থামিয়ে ফিরে তাকাল হরিণ, সাপটাকে দেখেই লাফ মারল। দড়ি না থাকলে তিন লাফে হারিয়ে যেত বনের ভেতর। সেটা তো পারল না, দড়িটাকে টেনে টানটান করে রেখে পা ছুঁড়তে লাগল অনবরত। খুরের ঘায়ে মাটি উড়ে গিয়ে লাগছে সাপের মুখে।

দড়ি টেনে সঙ্কেত দিল আবার কিশোর।

টান দিল মাস্তুলের কাছে বসা লোকটা। আস্তে আস্তে সরিয়ে নিতে লাগল হরিণটাকে।

একটু একটু করে হরিণটা সরছে গাছের দিকে, সাপ এগোচ্ছে তার দিকে। কামড় বসাবার জন্যে মাথা তুলেও নামিয়ে ফেলছে, বার বার সরে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে শিকার।

একটা ফাঁস হাতে মুসা তৈরি। তার পেছনে আর আশেপাশে অন্যেরা।

গাছের গোড়ায় চলে এল হরিণ। সাপটা তার থেকে ছয় ফুট দূরে। দ্রুত

আসছে।

'এবার!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

ফাঁস হাতে গাছের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল মুসা। অন্যেরা বেরোল দু-দিক থেকে। লেজে ফাঁস পরানোর জন্যে ছুটে গেল দু-জন।

মুসাকে দেখে পিছাল না সাপটা, ভীষণ ভঙ্গিতে মাথা তুলল। সামান্যতম ভুল এখন মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। ছোবল হানার আগেই সাপের গলায় পরিয়ে দিতে হবে ফাঁস।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে বিশাল মাথাটা, ফাঁক হয়ে গেছে চোয়াল। তীব্র গতিতে এগিয়ে আসবে যে কোন মুহূর্তে। মুসাও ফাঁস ছুঁড়ল, সাপটাও ছোবল হানল। কিন্তু ধরতে পারল না মুসাকে। লাফিয়ে পাশে সরে গেছে সে। ফাঁসটা মাথা গলে গলার কাছে চলে গেছে। হ্যাঁচকা টানে আটকে দেয়া হলো।

দড়ির আরেক মাথা খাঁচার দরজার ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে, পেছনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বের করে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে আগেই। জাগুয়ারকে যেভাবে টেনে ঢুকিয়েছে, সাপটাকেও সেভাবেই ঢোকানোর ইচ্ছে। লেজে ফাঁস লাগিয়ে টেনে শরীরটাকে সোজা রাখতে পারলে ঢোকানো যাবে ওভাবে।

কিন্তু মোটেই সহজ হলো না কাজটা।

এক জায়গায় থাকছে না লেজ, খালি এপাশ ওপাশ নড়ছে। অনেক চেষ্টায় একটা মাত্র ফাঁস পরানো গেল। কিন্তু ধরে রাখতে পারল না লোকটা, হ্যাঁচকা টানে দড়ি ছুটে গেল তার হাত থেকে।

লেজের বাড়িতে চিত হয়ে গেল জিবা আর দু-জন ইনডিয়ান।

আরেকটা ফাঁস হাতে এগোল মিরাটো। এত বেশি কাছে চলে গেল, দড়ির ফাঁস পরানোর আগে সে নিজেই আটকা পড়ল লেজের ফাঁসে। শরীর মুচড়ে মুচড়ে ফাঁসটাকে ওপরের দিকে সরিয়ে আনছে সাপ। বিচিত্র ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে সরে যাচ্ছে মিরাটোর শরীরটা। পুরোপুরি অসহায় সে, কিছুই করতে পারছে না। মুক্তি পাওয়ার জন্যে খালি হাত-পা ছুঁড়ছে।

তাকে সাহায্য করতে এগোল কিশোর।

মিরাটোকে শরীরের মাঝামাঝি জায়গায় নিয়ে এল সাপ, লেজটা মুক্ত করে ফেলেছে। এদিক ওদিক নাড়ছে আবার আরেকজনকে ধরার জন্যে।

কিশোরের ভাগ্য ভাল, ফাঁসে আটকা পড়ল না, কিন্তু বাড়ির চোটে উড়ে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে। গাছের সঙ্গে ঠুকে গেল কপাল, বেঁহুশ হয়ে গেল সে।

ছুটে গেল রবিন। টেনেহিঁচড়ে সরাল কিশোরকে। দৌড়ে গিয়ে আঁজলা ভরে পানি এনে ছিটাতে লাগল তার চোখেমুখে।

মুসার দিকে এগোচ্ছে সাপটা। পিছাতে গিয়ে শেকড়ে লেগে চিত হয়ে পড়ে গেল সে। এই সুযোগে দ্রুত এগোল বিশাল মাথাটা, বিকট হাঁয়ের ভেতর থেকে বাঁকা, চোখা দাঁতের ফাঁক দিয়ে লকলক করে বেরোচ্ছে লম্বা জিভ। অ্যানাকোণ্ডার মানুষ আক্রমণের রোমাঞ্চকর সব গল্প মনে পড়ল তার।

কোনমতে সরে এল সে। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল লেজের দিকে।

প্যাঁচে আটকে রয়েছে মিরাটো। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। অবশ নিষ্প্রাণ মাথাটা নড়াচড়ায় একবার এদিক ঝুলে পড়ছে, একবার ওদিক। ঘুরে ঘুরে এগিয়ে চলেছে সাপের মাথার কাছে।

মুখ ঘোরাল সাপটা।

মিরাটোকে বাঁচানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল মুসা। বিপদের পরোয়া না করে ছুটে গিয়ে দু-পা ফাঁক করে দাঁড়াল সাপের ওপর, বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরল দুই চোখ। অ্যানাকোণ্ডার সবচেয়ে দুর্বল জায়গা।

যন্ত্রণায় মোচড়াতে শুরু করল সাপের শরীর, চাবুকের মত সপাসপ বাড়ি মারছে লেজ দিয়ে। কিন্তু কারও গায়ে লাগছে না, সবাই রয়েছে নিরাপদ দূরত্বে। প্যাঁচ থেকে খুলে একটা ঝোপের ওপর গিয়ে পড়ল মিরাটোর দেহটা।

চোখ ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেল মুসা। মিরাটোর বুকে কান পেতে শুনল, নাড়ি দেখল। নেই। সব শেষ।

উঠে দাঁড়াল আবার সে। কড়া চোখে তাকাল সাপটার দিকে। মিরাটোর মৃত্যু বৃথা যেতে দেবে না।

কিশোরের জ্ঞান ফিরেছে।

টানাটানিতে সাপের গলার ফাঁসটা আরও চেপে বসেছে। দড়ি ধরে খাঁচার দিকে টানতে লাগল তিন গোয়েন্দা। দম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাবু হয়ে আসছে অ্যানাকোণ্ডা। লেজে আটকানো ফাঁসের দড়িও টেনে নিয়ে গিয়ে পেঁচিয়ে ফেলা হলো আরেকটা গাছে। দড়িটা ধরে রাখল দু-জন ইনডিয়ান, অন্য দু-জন আরেকটা ফাঁস আটকে দিল লেজে।

এরপর আর বিশেষ অসুবিধে হলো না। মাথার দিক থেকে দড়ি টানতে লাগল কয়েকজন, অন্যেরা লেজের দড়ি একটু একটু করে ছাড়তে লাগল। শরীর মুচড়ে, আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল সাপ, পারল না, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল খাঁচার দিকে।

অবশেষে বিশাল মাথাটা ঢুকল দরজার ভেতর।

সাপের অর্ধেকটা শরীর খাঁচায় ঢুকে যাওয়ার পর লেজের দড়িতে বেশি করে ঢিল দেয়া হলো। বার দুই এদিক ওদিক নেড়ে মানুষ ধরার চেষ্টা করল লেজটা, তারপর আপনাআপনি ঢুকে গেল ভেতরে। লাগিয়ে দেয়া হলো দরজা।

খুশি হতে পারল না কেউ। অ্যানাকোণ্ডার জন্যে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে।

গায়ের ছেঁড়া শার্ট খুলে ভিজিয়ে এনে মিরাটোর রক্তাক্ত মুখ মুছে দিল মুসা। চোখের পানি ঠেকাতে পারল না। ভালবেসে ফেলেছিল তরুণ ইনডিয়ানকে। আজ একজন বড় বন্ধুকে হারাল তিন গোয়েন্দা।

মিরাটো চলে যাওয়ায় বড় বেশি অসহায় মনে হলো নিজেদেরকে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। লাশের পাশে বসে রইল তিনজনে।

খাঁচাটা নৌকায় তুলল ইনডিয়ানরা। বাঘটাকে পানি ভরল। তারপর ফিরে এল কবর খুঁড়তে।

যে গাছের তলায় জীবন দিয়েছে মিরাটো, সেদিন সন্ধ্যায় সেখানেই কবর দেয়া হলো তাকে।

এগারো

নদীর ভাটির দিকে একটানা চলেছে বজরা-বহর। সবাই বিষণ্ণ। কিশোরের একমাত্র ভাবনা, কি করে এখন ম্যানাও পৌঁছে স্টীমারে জানোয়ারগুলো তুলবে।

তিন গোয়েন্দার কাছে এখন জঙ্গল শুধু মৃত্যু আর আতঙ্ক।

এই সময় মুসার উঠল জ্বর। অবহেলা করে ম্যালেরিয়া নিরোধক ট্যাবলেট খায়নি নিয়মিত, হ্যামকের ওপর মশারী খাটায়নি। এক রাতের মশার কামড়েই ধরে ফেলেছে। ছোট বজরার টলডোর ছাতে শুয়ে রইল সে।

ভ্যাম্পের দেখা নেই। কিশোর আশা করল, ডাকাতটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। কিন্তু একদিন জংলীদের ঢাকের শব্দ কানে এল। একটা বাঁক পেরিয়ে দেখা গেল গ্রামে আগুন। ভ্যাম্পের দলের কাজ না-তো? ওরা লাগিয়েছে? শিওর হলো কিছুক্ষণ পরই, যখন দেখল, চরের ওপর পড়ে রয়েছে ডাকাতদের নৌকাটা। ভেসে যাওয়ার ভয়ে ডাঙায় তুলে রেখে গেছে।

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল কিশোর। মুসা অসুস্থ, মিরাটো নেই, এখন যদি এসে ভ্যাম্পের দল আক্রমণ করে, ঠেকাতে পারবে না। ডাকাতদের অলক্ষে এখন কোনমতে পালাতে পারলে বাঁচে।

আরও মাইল পাঁচেক ভাটিতে একটা খালের মুখে থামল সেদিন রাত কাটানোর জন্যে।

বার বার কান পেতে শুনছে লোকেরা। ঢাক এখনও মাঝে মাঝেই বেজে উঠছে। অনেক দূর থেকে জবাব আসছে সে-শব্দের। তারমানে খবর দেয়া হচ্ছে অন্য গ্রামের জংলীদের, দাওয়াত করছে, কিংবা সাহায্যের আবেদন। ঢাকের শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে বন।

ভীষণ ভয় পাচ্ছে কিশোরদের সঙ্গের ইনডিয়ানরা। আগুনের কাছে গায়ে গা ঠেকিয়ে জড়সড় হয়ে বসেছে। ফিসফাস করছে। তাদের আরও উত্তেজিত করে তুলছে জিবা।

কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'কি হয়েছে, জিবা?'

'ঢাক, সিনর। এরা ঢাকের শব্দে ভয় পাচ্ছে।'

'কেন? এক ইনডিয়ান অন্য ইনডিয়ানকে জবাই করবে না।'

'এক গোত্রের না হলে করবে। এখানকার ইনডিয়ানরা ভারি পাজী, বুনো। বিদেশী মানুষকে দেখতে পারে না, তাদেরকে যারা সাহায্য করে, তাদেরকেও না। তোমাকে ধরতে পারলে খুন করে ফেলবে, সঙ্গে যারা আছে কাউকে ছাড়বে না।'

হাসল কিশোর। 'যতখানি বলছ, ততটা হয়তো নয়। প্রথম থেকেই তো বাড়িয়ে বলা শুরু করেছ।'

নদীর ধারে গেল জিবা আর তার সঙ্গীরা, গাঁয়ে কি ঘটছে দেখার জন্যে। উত্তেজিত হয়ে উজানের দিকে কি যেন দেখাচ্ছে আর বলাবলি করছে। পায়ে পায়ে তাদের কাছে চলে গেল কিশোর, রবিন রইল মুসার কাছে।

রক্তাক্ত সূর্যাস্তের পটভূমিতে জংলীদের জ্বলন্ত গ্রামের ধোঁয়া কেমন যেন বিষণ্ণ করে তুলেছে পরিবেশ। কিন্তু সেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি ইনডিয়ানদের, তারা চেয়ে আছে নৌকার দিকে। এদিকেই ভেসে আসছে নৌকাটা। দূর থেকেই যাত্রীদের দেখা গেল। কিশোর গুনল, নয় জন। চুপ করে বসে আছে ওরা, দাঁড় বাইছে না।

একেবারে নড়ছে না, আশ্চর্য তো!

হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল কিশোরের হাত-পা।

আরও কাছে এসে গেছে নৌকা। সাঁঝের আবছা আলোয় এখন কিছুটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নয় জন মানুষকে। কেন কেউ নড়ছে না বোঝা গেল এতক্ষণে। একজনেরও মাথা নেই।

স্রোতের টানে পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে চলে এল নৌকা। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে জিবা, থরথর করে কাঁপছে।

নয়টা মুণ্ডশূন্য ধড়! কাপড় দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওরা ইনডিয়ান নয়।

নিশ্চয় ভ্যাম্পের ডাকাতদল। এতদিন অন্যের গলা কেটেছে, এবার নিজেদের গলাই কাটা পড়ল। জংলীদের গাঁয়ে আগুন লাগানোর পরিণতি।

আতঙ্কিত যেমন হয়েছে, সেই সাথে স্বস্তিও পাচ্ছে কিশোর।

বারো

সকালে চোখেমুখে রোদ লাগলে ঘুম ভাঙল কিশোরের। অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল, মুখের ওপর হাত রেখে পড়ে রইল চুপচাপ।

সকালের এই কয়েকটা মুহূর্ত এখানে উপভোগ করে সে। আগুন জ্বালানোর জন্যে এই সময় কাঠ জোগাড়ে ব্যস্ত হয় ইনডিয়ানরা। তাদের অলস কথাবার্তা, কেটলি আর মগের ঠোকাঠুকির শব্দ, ধোঁয়া আর কফির গন্ধ, ভাল লাগে তার।

কিন্তু আজ এত চুপচাপ কেন? শুধু জঙ্গলের পরিচিত কোলাহল, আর মাঝে মাঝে জংলীদের ঢাকের একঘেয়ে দিড়িম দিড়িম।

চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে কাত হয়ে তাকাল কিশোর। আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে থাকার কথা ইনডিয়ানদের, হাতে মগ।

কিন্তু কেউ নেই। জনশূন্য ক্যাম্প।

এমন তো হওয়ার কথা নয়! হ্যামক থেকে নামল কিশোর। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়েই যেন হোঁচট খেল। বড় বজরার পেছনে নোঙর করা মনট্যারিয়াটা নেই।

ভয় পেল কিশোর, প্রচণ্ড ভয়। মনকে বোঝাল, নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গেছে লোকগুলো, নাস্তার জন্যে। কিন্তু তা-ই যদি হবে, সবাই কেন? বড় জোর, দু-জন যাবে, অন্যেরা থাকবে আগুনের কাছে।

ভাটির দিকে যতদূর চোখ যায়, তাকাল সে। কোন নৌকার চিহ্নও নেই।

নিজেকে প্রবোধ দেয়ার আর কোন মানে হয় না। যা সত্য, সেটাকে মেনে নেয়াই উচিত। ইনডিয়ানদের নিয়ে পালিয়েছে জিবা।

রবিনকে ডেকে তুলল কিশোর। মুসা প্রায় অচেতন।

দেখা গেল, শুধু নৌকাটাই নিয়েছে ওরা, মালপত্র সব আছে। এমনকি মন্টারিয়ায় যেসব জানোয়ার ছিল, সেগুলোকেও রেখে গেছে বড় বজরায়, বোধহয় ভার কমিয়েছে। ছেড়ে দিল না কেন? খাবার, জাল, মাছ ধরার সরঞ্জাম, মূল্যবান কাগজপত্র, ওষুধ, বন্দুক, গুলি, সব রয়েছে। ছোঁয়ওনি কিছু।

ভীষণ জঙ্গলে একা এখন তিন গোয়েন্দা, অসহায়। মুসা জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ। নরমুণ্ড শিকারীরা খেপে আছে। আগের দিন বিকেলের বীভৎস দৃশ্যটা মনে পড়ল কিশোরের। শিউরে উঠল। কল্পনা করল, বড় বজরায় জানোয়ারের সঙ্গে তিনটি কাটা ধড়...আর ভাবতে পারল না সে।

দুর্বল কণ্ঠে ডাক দিল মুসা।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল রবিন।

পানি চায় মুসা।

কপালে হাত দিয়ে দেখল রবিন, পুড়ে যাচ্ছে। পকেটেই ট্যাবলেট আছে, পানির সঙ্গে ওষুধও খাইয়ে দিল। সংক্ষেপে জানাল, কি ঘটেছে।

ম্যালেরিয়া চিন্তাশক্তি ঘোলাটে করে দিয়েছে মুসার। রবিনের কথা ঠিকমত বুঝতে পারল না, কিংবা কানেই ঢুকল না। বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছ না কেন?'

উঠে চলে এল রবিন।

ইতিমধ্যে আগুন ধরিয়ে ফেলেছে কিশোর। নাস্তা বানাতে বসল দু-জনে। কানে আসছে ইনডিয়ানদের ঢাক। ইস্ থামে না কেন? পাগল করে দেবে নাকি?

চামচ দিয়ে ডিম আর কফি খাওয়ানো হলো মুসাকে।

তারপর রাইফেল নিয়ে শিকারে চলল কিশোর আর রবিন। জানোয়ারগুলোকে খাওয়াতে হবে, বিশেষ করে অ্যানাকোণ্ডাকে। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে উঠেছে ওটা। লেজের বাড়ি মেরে সমস্ত পানি ফেলে দিয়েছে খোল থেকে। আগে তার পেট ঠাণ্ডা না করে পানি ভরেও লাভ নেই, আবার ফেলে দেবে।

চওড়া খাল। খালের ধার ধরে এগিয়ে চলল দু-জনে। কোন জানোয়ার পানি খেতে এলে গুলি করবে।

হঠাৎ থেমে গেল কিশোর। রবিনকেও থামাল। হাত তুলে দেখাল সামনে। কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে আছে একজোড়া ইনডিয়ান দম্পতি, মেয়েটা কোলের বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

ভালমত আরেকবার দেখে হেসে ফেলল গোয়েন্দাপ্রধান। খুদে চোখ, ভোঁতা নাক আর মোটা ঠোঁট দেখা যাচ্ছে।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাগরে কত নাবিক যে বোকা বনেছে ওগুলোকে দেখে। সাগর থেকে ফিরে এসে গল্প করেছে, মৎসকন্যার দেখা পেয়েছে তারা। ওগুলোর অর্ধেক শরীর মানুষের মত, অর্ধেক মাছের। সাগরের কিনারে পাথরে বসে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায়, চুল আঁচড়ায়। যা দেখেছে তার সঙ্গে রঙ চড়িয়েছে অনেক বেশি।

নাবিকদের দোষ দেয়া যায় না। এই তো, এইমাত্র কিশোর আর রবিনও তো বোকা বনল, কাছে থেকে দেখেও।

আরও এগোল দু-জনে। মুখ অনেকটা গরুর মত জীবগুলোর। ম্যানাটি। ব্রাজিলিয়ানরা বলে কাউফিশ, অর্থাৎ গরুমাছ।

ঘন শেওলায় লেজ ডুবিয়ে বসে আছে ম্যানাটি দুটো। মাদীটা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, মদ্দাটা পদ্মের কুঁড়ি খুঁটছে। দশ ফুট করে লম্বা হবে একেকটা, হোঁতকা, টনখানেকের কম হবে না ওজন। অ্যানাকোণ্ডার প্রিয় খাবার, কিন্তু এতবড়গুলোকে মেরে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

পাখনা আর লেজের ঝাপটা শুনে চোখ ফেরাল কিশোর। আরও ম্যানাটি রয়েছে কাছাকাছি। ছোট একটা দেখল, পাঁচ ফুটও হবে না। হ্যাঁ, এইটা হলে চলে। পাড়ের কাছে অল্প পানিতে জলজ ঘাসের ডগা ছিঁড়ে খাচ্ছে জীবটা।

খুব কাছে থেকে গুলি করল কিশোর।

গুলির শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব দিল বড় ম্যানাটি দুটো। ছটফট করছে গুলি-খাওয়াটা। তলিয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে ছুটে এসে প্রায় মাথায় ঠেকিয়ে আবার গুলি করল কিশোর। রাইফেল বলে মারতে পেরেছে, বন্দুক হলে পারত না। খুব শক্ত ম্যানাটির চামড়া, ইনডিয়ানরা বর্ম বানায়, শটগানের গুলি হয়তো চামড়াই ভেদ করত না।

দুটো গুলি খেয়েও সঙ্গে সঙ্গে মরল না ম্যানাটিটা। তীরের মাটিতে গরুর মত নাক দিয়ে গুঁতো মারতে লাগল, তারপর স্থির হয়ে গেল। ডাঙায় তোলার চেয়ে পানি দিয়ে টেনে নেয়া সহজ, খাটুনি কম হবে। লেজ ধরে ওটাকে টেনে নিয়ে চলল দু-জনে।

পিচ্ছিল চামড়া। তাই নৌকায় টেনে তুলতেও বিশেষ অসুবিধে হলো না। খাঁচার দরজার কাছে ম্যানাটিটাকে নিয়ে এল ওরা।

খিদেয় পাগল হয়ে গেছে সাপটা। খাঁচার দরজায় বার বার বাড়ি মারছে মাথা দিয়ে। এরকম চালিয়ে গেলে এক সময় খাঁচা ভেঙে যাবেই। তিরিশ ফুট লম্বা শরীরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে রেখেছে। খুব শয়তান জীব। অ্যানাকোণ্ডা কখনও পোষ মেনেছে বলে শোনা যায়নি। ইনডিয়ানদের বন্ধু বোয়া, কুকুর-বেড়ালের মতই পোষ মানে। কিন্তু সাপের জগতের ডাকাত অ্যানাকোণ্ডাকে এড়িয়ে চলে জংলীরাও। কারও সঙ্গেই তার ভাল না দানবগুলোর।

খাবার তো আনা হলো, এখন খাওয়াবে কি করে? খাঁচার দরজা খোলার সঙ্গে

সঙ্গে ছোবল হানবে কুৎসিত মাথাটা, পা কামড়ে ধরে চোখের পলকে কিশোরকে টেনে নেবে ভেতরে, পাকে জড়িয়ে ভর্তা করে ফেলবে।

কুঁই কুঁই করে ছুটে এল নাকু, খিদে পেয়েছে জানাচ্ছে। ক্ষুধার্ত চোখে তার দিকে তাকাল অ্যানাকোণ্ডা, মাথাটা পিছিয়ে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছোবল মারল, খাঁচায় বাঁশের বেড়া না থাকলে নাকুর জীবনের ওখানেই ইতি ঘটত।

উপায় পাওয়া গেল। নাকুকে তুলে নিয়ে খাঁচার কোণার কাছে চলে এল কিশোর। সেদিকে চোখ রেখে খাঁচার ভেতরে অনুসরণ করল অ্যানাকোণ্ডার মাথা, কোণায় চলে এল।

খাঁচার বাইরে কয়েক ফুট দূরে নাকুকে রেখে, রবিনকে ধরতে বলল কিশোর।

স্থির চোখে চেয়ে আছে অ্যানাকোণ্ডা, সম্মোহন করছে যেন। এভাবে সম্মোহন করে নাকি শিকারকে দাঁড় করিয়ে রাখে, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে খপ করে ধরে। কিন্তু নাকুর ওপর বিশেষ সুবিধে করতে পারল না সাপ, শক্ত করে ধরে রেখেছে রবিন। তাপিরটাকে নড়তেই দিচ্ছে না।

খাঁচার দরজার কাছে চলে এল কিশোর। অ্যানাকোণ্ডার দৃষ্টি অন্য দিকে, এই সুযোগে খাঁচার পাল্লার কিনারে দড়ি পেঁচাল সে। তারপর বাঁধন খুলল। দড়িটা সামান্য ঢিল রেখেছে, দুই-তিন ইঞ্চি ফাঁক হয় টানলে। ম্যানাটির চ্যাপ্টা লেজ ঢুকিয়ে দিল সেই ফাঁকে। তাপিরটাকে সরিয়ে নিতে বলল।

নিয়ে গেল রবিন।

ম্যানাটির ওপর চোখ পড়ল অ্যানাকোণ্ডার। এক লাফে চলে এল মাথাটা। খপ করে কামড়ে ধরে টানতে শুরু করল।

পেঁচানো দড়িতে আরেকটু ঢিল দিল কিশোর, খানিকটা ঢুকল ম্যানাটির শরীর। এভাবে ঢিল দিতে দিতে অনেকখানি ফাঁক করে ফেলল দরজা, টান দিয়ে শিকারের পুরো শরীরটাই খাঁচার ভেতরে নিয়ে গেল সাপ। তাড়াতাড়ি আবার দরজা বন্ধ করে বেঁধে ফেলল কিশোর।

অ্যানাকোণ্ডা যখন শিকার ধরে, আর কোন দিকে খেয়াল করে না। কি করে শিকার গিলবে, খালি সেই ভাবনা। দেখতে দেখতে গিলে ফেলল ভারি ম্যানাটিটাকে।

'যাক, কয়েক হপ্তার জন্যে নিশ্চিন্ত,' ভাবল কিশোর। 'পেট খালি না হলে আর গোলমাল করবে না।'

বাকি জীবগুলোকে খাওয়াতে লাগল সে। রবিন সাহায্য করছে বটে, কিন্তু মুসার মত পারছে না। এসবের জন্যে মুসা একাই যথেষ্ট। এই মুহূর্তে সহকারী গোয়েন্দার অভাব খুব অনুভব করছে কিশোর, জানোয়ারগুলোর ভাবভঙ্গিতেও মনে হচ্ছে, ওরা মুসাকে খুঁজছে।

খাওয়াচ্ছে, সেই সঙ্গে ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। ভ্যাম্পের ডাকাতদলের সবাই কি মারা গেছে? কতজন লোক ছিল দলে? সেদিন রাতে যখন আক্রমণ করছিল, আট-দশজনকে দেখা গেছে। নৌকায় ভেসে গেছে নয়টা ধড়।

দশজন হলে বাকি থাকে একজন। কেন যেন তার মনে হচ্ছে, একজন জীবিত আছেই, ড্যাম্প। ড্যাম্পায়ার মরেনি। এত সহজে মরতে পারে না তার মত শয়তান। দিনের বেলা জেগে জেগেই দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল সে। হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল, পারল না। অমাবস্যার রাতের চেয়ে ভয়ঙ্কর, নির্জন, আর ভূতুড়ে মনে হচ্ছে এখন জঙ্গলটাকে। সঙ্গী আরও দু-জন রয়েছে তবু মনে হচ্ছে বড় একা সে। কালোবনের এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতাবোধ পাগল করে দিয়েছে অনেক অভিযাত্রীকে।

নৌকা থেকে নামল দু-জনে।

রবিন গেল মুসার কপালে জলপট্টি দিতে। কিশোর বসে রইল একটা গাছের গোড়ায়। কাজ তেমন কিছু করেনি, অথচ সাংঘাতিক ক্লান্তি লাগছে। ম্যালেরিয়া তাকেও ধরছে না-তো?

মাথায় কারও হাতের স্পর্শ লাগল। না, রোগেই ধরছে! আবল-তাবল কল্পনা শুরু হয়ে গেছে তাই। কিন্তু চাপ বাড়ছে মাথায়, কল্পনা নয়। ফিরে তাকাল সে। হ্যাঁ, কল্পনাই। নইলে ড্যাম্পের চেহারা দেখবে কেন? কুৎসিত চেহারাটা আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে এখন। শার্ট-প্যান্ট শতছিন্ন, রক্তাক্ত। উষ্কখুষ্ক চুল। গালে-মুখে-হাতে কাঁটার আঁচড়।

মাথা ঝাড়া দিয়ে দুঃস্বপ্নটা দূর করতে চাইল কিশোর। পাশে রাখা রাইফেলে হাত দিল। লাফ দিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল। রাইফেল তুলল। গুলি করার দরকার হলো না। তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল নিরস্ত্র দুর্বল ড্যাম্প।

আবার মুখ তুলল, 'মেরো না, আমাকে দোহাই তোমার!' করুণ মিনতি। 'ওদেরকে ধরতে দিও না। কেটে ফেলবে আমাকে···ধড় থেকে কল্লা আলাদা করে ফেলবে···'

'সেটাই তোমার উচিত সাজা হবে,' কঠিন কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমাদের কাছে এসেছ সাহায্য চাইতে। লজ্জা করে না?'

'শোনো, ভাই,' কেঁদে ফেলল ড্যাম্প, 'আমরা বিদেশী। শত্রু হলেও এখন বন্ধু। আমাদের একসঙ্গে থাকা উচিত। ওদের হাতে তুলে দিও না আমাকে।'

'ওদের গাঁয়ে আগুন দিয়েছিলে?'

'ভুল করে ফেলেছিলাম।'

'কাউকে মেরেছ?'

'বেশি না। কয়েকটা জংলী মরলে কি এসে যায়, বলো?' উঠে বসল সে, থরথর করে কাঁপছে। 'আমার পিছু নিয়েছে ওরা।'

পুরো এক মিনিট ড্যাম্পের পেছনে জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইল কিশোর। ভাবল, কেন সাহায্য করবে খুনে ডাকাতটাকে?

কিন্তু অবশেষে না করে পারল না। নিরস্ত্র একজন মানুষকে মুণ্ড কাটার জন্যে তুলে দিতে পারল না ইনডিয়ানদের হাতে।

'এসো,' ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে শুরু করল কিশোর।

কাঁপতে কাঁপতে সঙ্গে চলল ড্যাম্প, বার বার বনের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। 'ঈশ্বর তোমার ভাল করবেই, ভাই।' কোলা ব্যাঙের ঘ্যাঁ-ঘ্যাঁ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। 'আমি জানি, আমাকে মারবে না তুমি। খুব ভাল ছেলে। তোমার বন্ধুরা কোথায়, ভাই? ওরাও খুব ভাল। জানি, আমাকে কিছু বলবে না। হাজার হোক, সবাই আমরা বিদেশী। ইনডিয়ানদের সঙ্গে কেন হাত মেলাব?'

ক্যাম্পে এসে এদিক ওদিক তকাল ড্যাম্প। 'তোমার লোকজন কোথায়?'

'পালিয়েছে।'

'হারামজাদারা! বেঈমান। ইনডিয়ান তো। বিশ্বাস নেই। জানোয়ারগুলো নিয়ে গেছে?'

'না। নৌকায় ওই বাঁকের মুখেই আছে।'

'ফাইন!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ড্যাম্প। 'তোমাদের কপাল খুব ভাল। লোকজন চলে গেছে বটে, কিন্তু আমি এসে পড়েছি। আর কোন চিন্তা নেই। আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমি নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাব ভাটিতে···তা ভাই, খাবার-টাবার আছে কিছু? চব্বিশ ঘণ্টা পেটে দানা পড়েনি।'

লোকটাকে খেতে দিল কিশোর।

'ওর কি হয়েছে?' মুসাকে দেখাল ড্যাম্প।

'জ্বর। ম্যালেরিয়া।'

'তাই নাকি? খুব খারাপ, খুব খারাপ। তা সত্যিই তোমরা একা? আর কেউ নেই?'

ঝট করে মুখ তুলল কিশোর, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। 'তাতে কি? কোন চালাকির চেষ্টা কোরো না। তুমিও একা। আমাদের কাছে বন্দুক আছে, তোমার কাছে তা-ও নেই···তোমার গলাকাটা দোস্তদের ভেসে যেতে দেখলাম কাল বিকেলে, নিজেদেরই গলা কাটা। তুমি পালালে কিভাবে? ওরা যখন লড়াই করছিল, নিশ্চয় ঝোপের মধ্যে চোরের মত লুকিয়েছিলে?'

'আমি হলাম গিয়ে নেতা, কেন ওদের সঙ্গে লড়াই করে মরতে যাব? বেতন খেয়েছে, কাজ করেছে। থাকগে, ওসব ফালতু আলোচনা করে লাভ নেই। যা ছিলাম ছিলাম, এখন ভাল হয়ে গেছি। প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে আর কারও কোন ক্ষতি করব না। কারও একটা চুল ছিঁড়ব না, যত টাকাই দিক না কেন আমাকে। অন্যের কাজ করতে গিয়েই তো আজ এই অবস্থা, মরতে মরতে বেঁচেছি। মার্শ হারামীটা বলল জানোয়ার চুরি করতে, আর আমিও রাজি হয়ে গেলাম···ছিহ্‌!' বিশাল একটুকরো মাংস মুখে পুরল সে। 'তোমাদের দেখে যা খুশি হয়েছি না, কি বলব। নিজের মায়ের পেটের ভাইকে দেখলেও এতটা হতাম না।'

'হ্যাঁ, হাবিল-কাবিলের মত ভাই,' টিটকারির ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

মানেটা বুঝল না ড্যাম্প। হেসে বলল, 'ঠিক বলেছ।' জঙ্গলের দিকে চাইল। ফিরে তাকাল পানির দিকে।

ফুলে উঠছে খালের পানি। কিশোরও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। আগের দিন

বিকেলে যতখানি ছিল, তার চেয়ে অনেক বেড়েছে পানি। স্রোত চলেছে নদীর দিকে। ভেসে যাচ্ছে উপড়ানো একটা গাছ। শুধু গাছই নয়, বন্যার সময় 'ভাসমান দ্বীপ'ও দেখা যায় আমাজনে। কয়েক দিন ধরে দেখা যাচ্ছে। তারমানে আসছে প্রচণ্ড বন্যা। প্রতিবছরই এই সময়ে বন্যা হয় এ-অঞ্চলে।

'ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে উজানে,' আনমনে বলল ভ্যাম্প। কিশোরের দিকে ফিরল। 'এখন যেখানে বসে আছি, আর হপ্তাখানেক পরে এটা থাকবে কয়েক ফুট পানির তলায়। কিংবা হয়তো দ্বীপ হয়ে ভেসে যাবে। চার-পাঁচতলা বাড়ির সমান বড় বড় মাটির টুকরো ভেঙে ভেসে যায় নদী দিয়ে। অদ্ভুত কাণ্ড, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। নৌকার সঙ্গে ওগুলোর ধাক্কা লাগলে···না না, তোমাদের চিন্তা নেই। নৌকা আমি সামলাব। যেভাবেই হোক, ম্যানাও পৌঁছে দেব তোমাদের।' খেয়ে-দেয়ে অনেক সুস্থ হয়েছে সে। কুৎসিত হাসিতে হলদে দাঁত বের করে বলল, 'আর ভয় নেই তোমাদের, আমি এসে গেছি।' বুকে হাত রাখল। 'আমি পৌঁছে দেব।'

সাঁ করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে খট করে গাছে বিঁধল একটা তীর।

দুই লাফে ঝোপে গিয়ে ঢুকল ভ্যাম্প। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটল।

'কি হলো?' বলে উঠল রবিন।

মুসাও মাথা তুলেছে।

'জংলী!' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'মুসা, শুয়ে থাকো।'

যেদিক থেকে তীর এসেছে সেদিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল সে, 'আমরা বন্ধু!'

লিংগুয়া জেরাল, অর্থাৎ ইনডিয়ানদের সাধারণ ভাষায় কথা বলেছে কিশোর, না বোঝার কথা নয় ওদের। কিন্তু জবাবে আরেকটা তীর উড়ে এল, অল্পের জন্যে তার কাঁধটা বাঁচল।

নয়টা ধড়ের কথা মনে পড়ল কিশোরের। চট করে তাকাল হ্যামকে শুয়ে থাকা মুসার দিকে। পাশে রবিন। ওদেরকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় লড়াইটা এখান থেকে সরিয়ে নেয়া।

ইনডিয়ানরা যেদিকে রয়েছে, একছুটে সেদিকের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সে। হাতে রাইফেল। ওরা বন্ধুত্ব না চাইলে গুলি খাবে।

'এই কিশোর, এই, কোথায় যাচ্ছ?' শোনা গেল রবিনের চিৎকার।

আরেকটা তীর শিস কেটে গেল কিশোরের কানের পাশ দিয়ে। মাত্র একটা করে তীর আসে কেন? ব্যাপার কি?

কারণটা জানা গেল। মাত্র একজন ইনডিয়ান। দৌড়ে গেল কিশোর।

রাইফেল-বন্দুক চেনা আছে ইনডিয়ানদের। কিশোরের হাতে রাইফেল দেখে ঘুরে দিল দৌড়। চেঁচিয়ে পেছন থেকে ডাকল কিশোর। কিন্তু কে শোনে কার কথা। গতি আরও বাড়িয়ে দিল জংলীটা।

প্রায় আধ মাইল পিছে পিছে গেল কিশোর। কিন্তু লোকটা থামল না। হারিয়ে গেল ঘনবনের ভেতরে, পোড়া গ্রামটা যেদিকে, সেদিকে।

কিশোর বুঝল, লোকটা গুপ্তচর। ভ্যাম্পের চিহ্ন অনুসরণ করে এসেছে। গ্রামে

ফিরে গিয়ে এখন জানাবে সব, দলবল নিয়ে আসবে।

ছুটে ক্যাম্পে ফিরে এল কিশোর। একটা মুহূর্ত নষ্ট করা চলবে না এখন। মুসাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে তুলতে হবে বজরায়, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় নোঙর তুলে পালাতে হবে।

দু-তিন কথায় রবিনকে সব বুঝিয়ে বলল কিশোর। হ্যামক খুলতে শুরু করল। দু-জনে ধরাধরি করে মুসাকে বয়ে নিয়ে এল নদীর পাড়ে।

উত্তেজনায় ভ্যাম্পের কথা ভুলে গিয়েছিল কিশোর, ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে পাড়ের উজ্জ্বল রোদে বেরিয়েই থমকে গেল। ধ্বক করে উঠল বুক।

বজরাটা নেই আগের জায়গায়!

তীব্র স্রোতে ভাটির দিকে ছুটে চলেছে ওটা। পাল তোলা। হাল ধরে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে হচ্ছে না ভ্যাম্পকে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাল ধরে রয়েছে অলস ভঙ্গিতে।

তিন গোয়েন্দাকে দেখে হাত নাড়ল। চেঁচিয়ে বলল, 'বিদায়, দোস্তরা। নরকে দেখা হবে আবার!'

তেরো

রাইফেল তুলেও নামিয়ে নিল কিশোর। রেঞ্জ অনেক বেশি। তাছাড়া ম্যাগাজিনে একটি মাত্র বুলেট অবশিষ্ট রয়েছে। তিনটে ছিল, দুটো খরচ হয়েছে ম্যানাটি মারতে।

মাথা গরম করলে চলবে না, নিজেকে বোঝাল সে। হ্যামকসহ মুসাকে মাটিতে নামিয়ে রেখেছে, তার পাশে বসে পড়ল। চিমটি কাটতে শুরু করল নিচের ঠোঁটে।

কতখানি খারাপ অবস্থায় পড়েছে, বোঝার চেষ্টা করছে। নৌকা নেই। সঙ্গে কোন যন্ত্রপাতিও নেই যে বানিয়ে নেবে। শুধু শিকারের ছুরিটা ঝোলানো আছে কোমরে। চেষ্টা করলে হয়তো একটা ভেলা বানাতে পারবে, কিন্তু তাতে অন্তত এক হপ্তা লাগবে। এত সময় নেই হাতে, আছে বড় জোর এক ঘণ্টা। হয়তো গাঁ পর্যন্ত যেতে হবে না ইনডিয়ান লোকটাকে, ভ্যাম্পকে খুঁজতে আরও লোক যদি বেরিয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ধরার জন্যে ছুটে আসবে ওরা। তাহলে এক ঘণ্টার আগেই আসবে।

জঙ্গলে গিয়ে লুকাতে পারে। কিন্তু বনে টিকে থাকার সরঞ্জাম সঙ্গে নেই, সব রয়ে গেছে বড় বজরায়।

কি কি আছে, হিসেব করল কিশোর। তিনজনের পরনের শার্ট-প্যান্ট, জুতো। তিনটে হ্যামক, একটা ছুরি, একটা রাইফেলে একটি মাত্র বুলেট, ব্যস।

এসব নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে টিকতে পারবে না। আর লুকাবে কার কাছ থেকে? ইনডিয়ানদের? চব্বিশ ঘণ্টাও বাঁচতে পারবে না, ধরা পড়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, জঙ্গলে ঢুকলে ভ্যাম্পের দেখা আর কোন দিনই পাবে না। পাবে না

পানিতেও, তবে নদী পথে এগোনো গেলে ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে।

খালের মুখের কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একটা দ্বীপ। ঝিক করে উঠল ভাবনাটা। বিপদের কথা ভাবল না, ঝুঁকি নিতেই হবে, এছাড়া উপায় নেই। বলল, 'রবিন, জলদি।'

কি জলদি, জিজ্ঞেস করল না রবিন। কিশোরকে ঘন ঘন দ্বীপটার দিকে তাকাতে দেখেই অনুমান করে নিয়েছে।

অন্য দুটো হ্যামক গুটিয়ে দিয়ে মুসার হ্যামকে রাখল। তারপর দু-জনে মিলে তাকে বয়ে নিয়ে চলল খালের মুখের কাছে।

ঘোলা হয়ে গেছে নদীর পানি। পাক আর স্রোত বাড়ছে। তুমুল বর্ষণ হচ্ছে নিশ্চয় অ্যান্ডিজের ওদিকে, পানি সরে আসছে নিচের দিকে। অসংখ্য ছোট-বড় ভাসমান দ্বীপ দেখা যাচ্ছে এখন, ভেসে চলেছে স্রোতে।

সামনে দিয়ে ভেসে চলেছে একটা দ্বীপ। না, এটাতে ওঠা যাবে না। কচুরিপানার সঙ্গে অন্যান্য লতা আর ঝোপ মিশে বিশাল এক ভেলামত তৈরি হয়েছে। প্রায় পুরোটাই পানির তলায়, ওপরে ভেসে রয়েছে শুধু নীল ফুলগুলো। ফুটখানেক পুরু, ছেলেদের ভার সইবে না। আর যদি সয়ও, অন্য বিপদ আছে। বড় বড় গাছ ভেসে যাচ্ছে, গড়াচ্ছে প্রাচীন স্টীমারের চাকার মত, ওগুলোতে লাগলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে কচুরি পানার ভেলা।

ওটাতে উঠল না ওরা।

আরেকটা দ্বীপ এল। ঝোপঝাড় লতাপাতা শক্ত হয়ে লেগে তৈরি হয়েছে। বড় একটা ঝোপ উপড়ে আটকে গিয়েছিল হয়তো চোখা পাথরে, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও ঝোপ, লতাপাতা, গাছের ডাল, ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, পাথরের আর সাধ্য হয়নি আটকে রাখার। ছুটে ভেসে চলে এসেছে ভেলাটা। এটাও ভাসমান দ্বীপ, কিন্তু মাটি নেই এতে।

সবচেয়ে আজব দ্বীপ হলো যেগুলোর মাটি আছে, ঝোপঝাড়, এমনকি গাছও আছে। পুরোপুরি দ্বীপ, ভাসমান, এবং সচল। প্রকৃতির এক আজব খেয়াল। কিশোর শুনেছে, ওগুলোর কোন কোনটা দুশো ফুট লম্বা হয়, বিশ ফুট পুরু। গাছপালা, মাটির বোঝা নিয়ে কি করে ভেসে থাকে, সেটা এক বিস্ময়।

বাছবিচারের সুযোগ বা সময় কোনটাই নেই। ঝুঁকি নিয়ে উঠে পড়তে হবে একটাতে। তবে কচুরিপানা কিংবা শুধু ঝোপের তৈরি ভেলায় ওঠা চলবে না।

রবিনকে কথাটা বলল কিশোর। রবিনও একমত হলো। মুসাকে কিছু বলে লাভ নেই, সে এখনও জ্বরের ঘোরে রয়েছে।

এগিয়ে আসছে আরেকটা ভেলা, ছোটখাটো একটা মাঠের সমান। তীর ঘেঁষে চলছে, কোণগুলো ঘষা খেতে খেতে আসছে পাড়ের সঙ্গে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর, ওটাতেই উঠবে।

সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় উঠে পড়ল সে, দু-হাতে ধরে রেখেছে হ্যামকের কোণ। অন্য দুই কোণ ধরে রবিনও উঠে পড়ল। খসে গেল কিনারের মাটি, লাফিয়ে

সরে গেল সে, কিন্তু হ্যামক ছাড়ল না। দ্বীপের ভেতরের দিকে সরে এসে তারপর নামাল ওটা।

সামনে নদীর বাঁকে বাধা পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে গভীর পানিতে সরে এসেছে স্রোত, দ্বীপটাও সরে চলে এল। আজব-যানে চড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলল তিন গোয়েন্দা।

দ্বীপে ওঠাটা পাগলামি মনে হচ্ছে এখন কিশোরের। কিন্তু তীরে বসে মুণ্ড কাটা যাওয়ার অপেক্ষায় থাকার চেয়ে এটা ভাল। যা হওয়ার হবে, ভেবে লাভ নেই। আপাতত জংলীদের হাত থেকে তো রেহাই পাওয়া গেল। তাছাড়া, ড্যাম্প যেদিকে গেছে সেদিকেই চলেছে ওরা।

ভাসমান দ্বীপের চেয়ে অনেক দ্রুত এগোচ্ছে ড্যাম্প, সন্দেহ নেই। কারণ সে রয়েছে নৌকায়। দ্বীপের চেয়ে অনেক হালকা, তার ওপর রয়েছে পাল। কিন্তু যদি বাতাস পড়ে যায়? কিংবা কোন বালির ডুবোচরে আটকায়? এমনও হতে পারে, ভেসে যাওয়া কোন গাছের সঙ্গেই আটকে গেল। যদিও সবই অতিকল্পনা, কিন্তু ভাবনাগুলো আসতেই থাকল কিশোরের মাথায়। ক্ষীণ একটা আশা—যদি ঘটে? যদি ঘটে যায় কোন কারণে?

নিজেদের ভাসমান রাজ্যটা ঘুরেফিরে দেখল কিশোর আর রবিন। পায়ের তলায় মাটি খুব শক্ত, খসে পড়ার ভয় নেই। আধ একর মত হবে। বেশির ভাগটাই ঘাসে ঢাকা। ছোট ছোট গাছপালাও আছে—সিক্রোপিয়া, রবার গাছ আর বাঁশ। বাঁশ বেশ লম্বা—দ্রুত গজায় বলে, কিন্তু অন্য গাছগুলো কয়েক ফুটের বেশি না।

হিসেব করে ফেলল কিশোরের হিসেবী মন। দ্বীপটা বছরখানেকের পুরানো। আগের বছরের বন্যায় আধ একর পলিমাটি জমেছিল কোন জায়গায়, বন্যা চলে যাওয়ার পর দ্বীপে রূপান্তরিত হয়েছিল। তার ওপর গাছের চারা গজিয়েছে। এ-বছর স্রোত ওই দ্বীপের তলা কেটে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে আস্ত দ্বীপটাকে, গাছপালাসহ।

কিন্তু বছরখানেকের পুরানো যদি হবে, দ্বীপের শেষ মাথায় ওই মস্ত গাছটা এল কিভাবে? দেখেই বোঝা যায়, একশো বছরের কম হবে না ওটার বয়েস। ভালমত পরীক্ষা করে দেখল দু-জনে। বিশাল তুলা গাছ। কাণ্ডটা পানির তলায়, কিন্তু ডালপালাগুলো ছড়িয়ে উঠে গেছে পঞ্চাশ ফুট ওপরে।

না, এই গাছ এ-দ্বীপের নয়। ভেসে আসার সময় গাছটার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল দ্বীপের, শক্ত হয়ে আটকে গেছে একটা আরেকটার সঙ্গে। ভাল। হ্যামক টানানোর চমৎকার জায়গা। মাটিতে থাকা নিরাপদ নয়। সাপের ভয় আছে। আরও নানা পোকামাকড়, বিশেষ করে সামরিক পিঁপড়ে। বন্যার সময় সবাই আশ্রয় খোঁজে। শুকনো জায়গা দেখলেই উঠে পড়ে।

কিচির মিচির শোনা গেল।

'বানর,' হাত তুলে দেখাল রবিন।

কিশোরও মুখ তুলে তাকাল। তাদের দিকেই চেয়ে আছে ছোট প্রাণীটা। বানভাসির শিকার।

গাধটা মোটামুটি ভালই, টিকবে ভরসা হচ্ছে। এখন প্রধান সমস্যা হলো খাবারের। আলোচনায় বসল দুই গোয়েন্দা।

বাকি দিনটা খাবার খুঁজে বেড়াল ওরা। বাঁশের কোঁড় খুঁজল, কিন্তু সবই বড় বড়। খাওয়ার মত কচি একটাও নেই। একটা ঝোপে ছোট ছোট জামের মত কিছু ফল পেকে আছে। কয়েকটা খেয়েই বমি করে ভাসাল দু-জনে, খাওয়ার অযোগ্য, বিষাক্ত। ছোট একটা গাছ দেখল, আমাজনের বিখ্যাত কাউট্রি বা গরুগাছ। ছাল কাটলে গরুর দুধের মত সাদা কষ বেরোয়, প্রোটিন সমৃদ্ধ। কিন্তু এই গাছটার ছাল কেটে কয়েক ফোঁটার বেশি রস পাওয়া গেল না, একেবারে চারা।

'সারভাইভাল' এর ওপর যত বই পড়েছে ওরা, প্রায় সবগুলোতেই একটা ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে : জঙ্গল, মেরু অঞ্চল, মরুভূমি, সাগর, সবখানেই বেঁচে থাকা যায় সামান্য কষ্ট করলে। কিন্তু এখন তাদের কাছে মোটেই সামান্য মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা। এতক্ষণ চেষ্টা করেও খাবারের কোন ব্যবস্থা করতে পারল না।

নদীতে মাছ অনেক আছে। কিন্তু বড়শি বা জাল নেই, ধরবে কি দিয়ে? ইনডিয়ানরা ধরে তীর ধনুক কিংবা বর্শা দিয়ে। ছুরি দিয়ে বাঁশ কেটে, চেঁছে, দুই ঘণ্টা পরিশ্রম করে একটা বল্লম বানানো গেল। কিন্তু দ্বীপের পাড়ে মাছ ধরতে এসে হতাশ হলো ওরা। যা স্রোত, মাছ দেখাই যায় না। বেশি উঁকিঝুঁকি মারতে গিয়ে পানিতে পড়লে শেষ। আর উঠতে পারবে না দ্বীপে।

ইতিমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, ভিজিয়ে দিয়ে গেল জামাকাপড়। দুটো হ্যামক ঢাকা দিয়ে মুসাকে শুকনো রাখা গেছে কোনমতে।

বৃষ্টির পর এল জোর বাতাস। আট-নয় মাইল চওড়া খোলা নদীর ওপর দিয়ে বয়ে গেল তুফানের মত, দাঁতে দাঁতে কাঁপুনি তুলে দিয়ে গেল ছেলেদের। মনে হলো মেরু অঞ্চলে ঢুকেছে ওরা। অথচ রয়েছে বিষুবরেখার খুব কাছাকাছি।

অন্ধকার হওয়ার আগ পর্যন্ত খাবার জোগাড়ের চেষ্টা করল ওরা। কিছুই পেল না। রাতে গাছের ডালে হ্যামক বেঁধে তাতে শোয়াল মুসাকে, আরেকটা দিয়ে ঢেকে দিল, বৃষ্টি এলে যাতে না ভেজে সেজন্যে। বাকি একটা হ্যামকে পালা করে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করল রবিন আর কিশোর।

অন্ধকার রাতে এই শীতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আগুন। জ্বালাতে পারবে না। ম্যাচ নেই। বিকল্প কোন উপায়ে হয়তো জ্বালানো যায়, কিন্তু জংলীরা দেখে ফেলার ভয় রয়েছে।

ক্ষুধায়, শীতে কাতর হয়ে হ্যামকে গিয়ে উঠল কিশোর।

গাছের ডালে বসে পাহারায় রইল রবিন। ভাসমান দ্বীপে কোন অজানা বিপদ লুকিয়ে আছে কে জানে। সাবধান থাকা উচিত। কয়েক ঘণ্টা পরে কিশোর এসে তার জায়গায় বসবে।

অন্ধকারে ছুটে চলেছে দ্বীপ। স্রোতের ওপর ভরসা এখন। সবচেয়ে বড় ভয়, নদীতে গজিয়ে থাকা আসল দ্বীপের সঙ্গে ধাক্কা লাগার। নিমেষে গুঁড়িয়ে যাবে তাহলে এটা। কিন্তু স্রোতের গুণাবলী সম্পর্কে যতখানি জানে রবিন, কোন কিছুর

সঙ্গে ধাক্কা খায় না, পাশ দিয়ে কেটে বেরিয়ে যায়। শুনেছে, এসব ভাসমান দ্বীপের সঙ্গে রাতে ক্যানু বেঁধে আরামসে ঘুমায় ইনডিয়ানরা। সকালে উঠে দেখে নিরাপদে পেরিয়ে এসেছে তিরিশ-চল্লিশ মাইল।

হ্যাঁ, ভ্যাম্পের তুলনায় এই একটা সুবিধে তাদের রয়েছে। অন্ধকারে নৌকা চালানোর সাহস করবে না ভ্যাম্প, কোথাও থামতেই হবে। কিন্তু ওরা চলবে। এগিয়ে যাবে অনেক পথ।

কখনও কখনও তীরের খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে দ্বীপ। বনের হাঁকডাক কানে আসছে। একবার তো এত কাছে একটা জাগুয়ার গর্জে উঠল, রবিনের মনে হলো, ওটা দ্বীপেই উঠে এসেছে। এমনিতেই বিপদের কূল নেই, তার ওপর জাগুয়ার উঠে এলে···ধ্যাত্তোর! যা হয় হোকগে! ভাগ্যের ওপর কারও হাত নেই। এই যে এই বিপদ পড়েছে, চব্বিশ ঘন্টা আগেও কি ভাবতে পেরেছিল এমন ঘটবে?

মাঝরাতের দিকে কিশোরকে তুলে দিল রবিন।

নিরাপদেই কাটল রাতটা। সকালে বানরটার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল রবিনের। ভোরের নিয়মিত প্রাত্যহিক কোলাহল জুড়েছে ওটা, সঙ্গীসাথী না পেয়ে একাই শুরু করেছে।

মুসার সঙ্গে কথা বলছে কিশোর।

খুশি হলো রবিন। মুসার শরীর তাহলে কিছুটা ভাল। নেমে এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখল, জ্বর নেই।

মলিন হাসি হাসল মুসা।

পেটে আগুন জ্বলছে তিনজনেরই। তাড়াতাড়ি খাবারের ব্যবস্থা করা দরকার। বিশেষ করে মুসার জন্যে। এমনিতেই কাহিল, খাবার না পেলে আর মাথাই তুলতে পারবে না। হয়তো জ্বরও ফিরে উঠবে আবার।

কিন্তু কি ব্যবস্থা করবে?

বিশুদ্ধ খাবার পানিও নেই। নদীর কাঁচা পানি খেলেই ধরবে টাইফয়েড কিংবা আমাশয়ে। ফুটিয়ে খেতে হবে। আগুন পাবে কোথায়? আর কেটলি? কোন পাত্রই তো নেই সঙ্গে।

কেটলির ব্যবস্থা করে ফেলল কিশোর। বাঁশ দিয়ে। একটা কচি বাঁশের গোড়ার দিকে একটা গাঁটের ঠিক নিচে থেকে কাটল। গাঁটের ওপরে আট ইঞ্চিমত রেখে বাকিটা কেটে ফেলে দিল। সারভাইভালের বইতে পড়েছে, কাঁচা বাঁশে পানি ফুটানো যায়, ভেতরে পানি ভরা থাকলে বাঁশ পোড়ে না।

কেটলি তো হলো, এবার আগুন?

আগুন জ্বালানোর চেষ্টা চালাল কিশোর আর রবিন। হ্যামকে শুয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল শুধু ক্লান্ত মুসা। কিছুই করার নেই তার। কোন সাহায্য করতে পারবে না।

গোড়াতেই সমস্যা দেখা দিল। আগুন জ্বালানোর জন্যে চাই শুকনো কাঠকুটো। নেই। সব ভিজে আছে আগের দিনের বৃষ্টি আর ভোর রাতের শিশিরে।

তবে জ্বালানীর ব্যবস্থা করা গেল। তুলা ফলের খোসা ভাঙতেই ভেতর থেকে বেরোল শুকনো পেঁজা পেঁজা তুলা। গাছের ডালের ভেজা বাকল কেটে ফেলে নিয়ে বের করা হলো মোটামুটি শুকনো লাকড়ি। তুলোর ওপর বিছিয়ে দেয়া হলো ওগুলো। তুলাতে আগুন ধরলে পরে লাকড়িতেও ধরবে।

এবার পাথর আর ইস্পাত দরকার, ঘষা দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ফেলবে তুলায়। ইস্পাত আছে, ছুরিটা। কিন্তু পাথর? আমাজনে পাথরের খুব অভাব, বিশেষ করে বন্যা উপদ্রুত এলাকায়। আর ভাসমান দ্বীপে থাকে পলিমাটি, পাথর থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

সারা দ্বীপ আঁতিপাতি করে খুঁজেও একটা পাথর পেল না ওরা।

অন্যভাবে চেষ্টা করল জ্বালানোর। চ্যাপ্টা কাঠে আরেকটা কাঠির মাথা জোরে জোরে ঘষলে উত্তাপে নাকি আগুন জ্বলে ওঠে। সেই চেষ্টাও করে দেখা হলো। ডলে ডলে দু-জনের হাতের চামড়াই শুধু ছিলল, আগুন জ্বলল না।

ইনডিয়ানরা আরেক কায়দায় আগুন জ্বালায়। চ্যাপ্টা কাঠে একটা খাঁজ কাটে। কাঠির মাথা চোখা করে ওই খাঁজের ওপর জোরে জোরে ডলে খুব তাড়াতাড়ি। সেই একই ব্যাপার—উত্তাপে জ্বলে ওঠে আগুন।

কিন্তু কিশোর আর রবিন চেষ্টা করেও পারল না। আগুন তো দূরের কথা, ধোঁয়াই বেরোল না। এসব কাজের জন্যেও অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা দরকার।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে হতাশ হয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। কি যেন লাগল আঙুলে। আনমনেই বের করে আনল।

চকচকে জিনিসটা কিশোরের হাতে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'পেয়েছি!'

অবাক হয়ে কিশোরও তাকাল হাতের দিকে। হাসি ফুটল।

ক্যামেরার একটা লেন্স। একটা বদল করে অন্য একটা লেন্স লাগানোর সময় এটা খুলে পকেটে রেখেছিল যে, পকেটেই রয়ে গেছে।

ভেজা ধোঁয়ার গন্ধ জীবনে আর এত ভাল লাগেনি কখনও ওদের কাছে। বুক ভরে টানতে গিয়ে বেদম কাশি উঠল রবিনের।

হ্যামকে শুয়ে হি-হি করে হাসল মুসা। ভারিক্কি ভাবটা কেটে গিয়ে হালকা হলো পরিবেশ। অনেকক্ষণ পর হাসি ফুটল তিনজনের মুখে।

পানি ফুটিয়ে আগে পিপাসা মেটাল ওরা।

এবার খাবার। মাছ ধরতে হবে, যেভাবেই হোক। আর কিছু পাওয়া যাবে না এখানে। বড়শির কাঁটা হয়তো বানানো যাবে, তবে আগে দরকার সুতা। ঘাস পাকিয়ে বানানোর চেষ্টা করল। শক্ত হয় না, ছিঁড়ে যায়। সমাধান করে দিল একটা ছোট গাছ। এর আঁশ দিয়ে রাশ, ঝাড়ু আর দড়ি তৈরি করা যায়।

দড়ি তো হলো, এবার বড়শি চাই। গাছের বাঁকা ডালের কথা ভাবল কিশোর। সাইজমত কেটে একমাথা চোখা করলে কি হবে? উঁহু। অন্য কিছু দরকার।

আগুন দেখে মাথার ওপর এসে কিচির মিচির শুরু করল বানরটা।

'কিশোর,' দুর্বল কণ্ঠে ডাকল মুসা। ইশারায় বানরটাকে দেখাল।

'দূর, কি বলো?' রবিন মাথা নাড়ল। 'সাপবিচ্ছু তো অনেকই খেলাম এই জঙ্গলে এসে। আর যাই বলো, বানর খেতে পারব না। মনে হবে মানুষ খাচ্ছি।'

এই দৃষ্টিতে বানরটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। একেবারে মাথার ওপর, মাত্র কয়েক ফুট দূরে। হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায় না অবশ্য। বাঁশ দিয়ে বানানো বল্লমটা তুলে নিল সন্তর্পণে। বানরটা কিছু বোঝার আগেই ধাঁই করে ছুঁড়ে মারল।

বল্লমে গেঁথে ধুপ করে পড়ল বানরটা।

'খাবে তাহলে!' রবিন বিশ্বাস করতে পারছে না।

'কেন, অসুবিধে কি?' হাসল কিশোর। 'অনেকেই তো খায়। ইনডিয়ানদের প্রিয় খাবার। আফ্রিকার পিগমিরা তো হরহামেশাই খায়। আর চীনারা কি করে জানো না?'

এসব সবই জানে রবিন। আস্ত বানরশিশুর চামড়া ছিলে, দামী ডিশে করে টেবিলে দেয়া হয়। কাঁচা। চীনের কিছু অঞ্চলের মানুষের কাছে এটা খুব প্রিয় খাবার। বিশেষ করে বানরের কাঁচা মগজ। দাম খুব বেশি বলে সাধারণ মানুষেরা খেতেই পারে না, যাদের পয়সা আছে তারাই কেবল পারে। মাথা নাড়ল সে, 'আমি খাব না। মরে গেলেও না। ওয়াক-থুহ্! শেষমেষ বানরের মগজ!'

কিন্তু খাওয়ার জন্যে মারেনি কিশোর। চামড়া ছুলে টুকরো টুকরো করে কাটল মাংস। হাড় দিয়ে চমৎকার কয়েকটা বড়শি হলো। ওগুলো পিয়াসাভার সরু দড়িতে বেঁধে, বাঁশ কেটে ছিপ বানাল। মাংসের একটা টুকরো গেঁথে বড়শি ফেলল পানিতে। দেখা যাক, ভাগ্য কি বলে?

ফেলতে না ফেলতেই টান পড়ল ছিপে। পিরানহা নাকি? তাহলেও চলে। খেতে ভালই।

ছিপ তুলল কিশোর। বিশেষ জোর লাগল না। আরে, এ-কি! আস্ত এক ফুটবল! রবিনও অবাক।

ছুরির মাথা দিয়ে খোঁচা মারল কিশোর। ঠুস করে বেলুনের মত ফাটল ওটা। মাছটা ছোট, পেটটাকেই ফুলিয়ে এত বড় করেছে। 'বেলুন মাছ,' বিড়বিড় করল সে। ছুঁড়ে ফেলে দিল পানিতে। এ-মাছ খাওয়া যায় না, বিষাক্ত।

আবার ছিপ ফেলল।

এবার উঠল বেশ বড়সড় একটা পেইচি। খাওয়া চলে, স্বাদ ভাল।

পেট ঠাণ্ডা হলো।

আর কোন কাজ নেই। আবার মাছ ধরতে বসল কিশোর আর রবিন।

আবার ছিপে টান পড়ল। বেশ জোর লাগল এবার তুলতে।

'সাপ!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। শরীর মোচড়াচ্ছে প্রাণীটা।

'বাইন,' বলল কিশোর। 'খাওয়া যেতে পারে।' বুঝতে পারল না ওটা কোন প্রজাতির। বড়শি থেকে খুলে নেয়ার জন্যে ধরতেই চিৎকার করে চোখ উল্টে পড়ল, বিকৃত হয়ে গেল চেহারা।

চোখ মেলে দেখল, রবিনের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে।

'ইস্, কি ভয়টাই পাইয়ে দিয়েছিলে,' বলল উদ্বিগ্ন রবিন। 'কি হয়েছিল?'

মুসাও হ্যামক থেকে মাথা বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে।

জবাব না দিয়ে কাত হয়ে বাইনটার দিকে তাকাল কিশোর। বড়শি ছুটে গেছে মুখ থেকে, ঘাসের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে রবিনের দিকে।

উঠে বসল সে। একটা লাঠির জন্যে তাকাল এদিক ওদিক।

রবিনেরও চোখ পড়ল বাইনটার ওপর।

'না না, ছুঁয়ো না!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সরানোর জন্যে ছুঁয়ে ফেলেছে রবিন। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার, তবে কিশোরের মত চোখ উল্টে পড়ল না। কারণ সে ছুঁয়েছে মাত্র, ধরেনি।

হাতের অবশ ভাবটা কাটল ধীরে ধীরে।

'হলো কি তোমাদের?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আস্ত জেনারেটর,' ভয়ে ভয়ে বাইনটার দিকে তাকাল রবিন। কিলবিল করে এগিয়ে আসছে ওটা। লাফ দিয়ে সরে গেল সে। হাত ঝাড়ছে এখনও।

গর্ত খুঁড়তে শুরু করল কিশোর।

'কি করছ?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

জবাব দিল না কিশোর। গর্ত খুঁড়ে তাতে পানি ভরে, একটা লাঠি দিয়ে ঠেলে নিয়ে গর্তে ফেলল বাইনটাকে। তারপর বলল, 'থাক।'

'কি হবে রেখে?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'খাওয়া যাবে?'

'দেখা যাক। আর কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে তো খাবই। বাইন মাছ অখাদ্য নয়।'

'কিন্তু ওটাকে ধরলেই তো চিত হয়ে যাচ্ছ? কি আছে ওর গায়ে?'

'এখনও বুঝতে পারছ না?' রবিন বলল। 'বিদ্যুৎ। ওটা বিদ্যুৎ-বাইন।'

'ও। আচ্ছা, ইলেকট্রিক শক তো বাত সারায় শুনেছি। ম্যালেরিয়া সারায় না?'

'সারায়। চিরতরে,' জবাব দিল কিশোর।

'মানে?'

'এমন সারানো সারাবে, কোনদিন আর ম্যালেরিয়া হওয়ারই সুযোগ পাবে না। সোজা পরপারে পাঠিয়ে দেবে তোমাকে।'

কিশোরের রসিকতা বুঝতে পেরে একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল মুসা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কত ভোল্ট?'

'যে শক খেয়েছি, তিনশোর কম তো হবেই না।'

'যত বেশি বড় হয়, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাও নিশ্চয় তত বেশি?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'সেটা নির্ভর করে কোন জাতের বাইন, তার ওপর। বিদ্যুৎ-বাইনেরও অনেক প্রজাতি। কোন কোনটার জেনারেটর সাংঘাতিক শক্তিশালী। মাত্র আড়াই ফুট লম্বা একটা বাইন ধরা পড়েছিল। পাঁচশো ভোল্ট

বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারত ওটা।'

'খাইছে!' চমকে গেল মুসা। 'মানুষ মারা তো কিছুই না!'

'মানুষ কি, ঘোড়াও মেরে ফেলতে পারে। পানিতে নেমে গরুঘোড়া অনেক মারে। বাইন মাছ গায়ে লাগে, শক খেয়ে অবশ হয়ে যায় শরীর। তারপর ডুবে মরে।'

কি মনে পড়ায় লাঠি দিয়ে আবার বাইনটাকে তোলার চেষ্টা করল কিশোর।

'কি হলো? আবার তুলছ কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'রকফেলার ল্যাবরেটরিতে দেখেছি, বড় বড় বাইনকে লেজ ধরে পানি থেকে তুলছে। অবাক হয়েছি। জিজ্ঞেস করে জেনেছি, লাইন কেটে বিদ্যুৎ চলাচল বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে ওগুলোর। ডায়নামোটা থাকে বাইনের মাথায়। লম্বা একটা নার্ভ ওখান থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত চলে যায়। ওই নার্ভের কোন জায়গায় কেটে দিলে তার নিচের দিকে আর বিদ্যুৎ যেতে পারে না। তখন ওখানে ধরলে আর অসুবিধে নেই।'

'এক্সপেরিমেন্ট করবে?'

'হ্যাঁ,' বলতে বলতেই লাঠির এক খোঁচায় বাইনটাকে ডাঙায় তুলে ফেলল কিশোর। লাঠি দিয়ে চেপে ধরল লেজের ছয় ইঞ্চি ওপরে। রবিনকে বলল, 'ধরো তো, লাঠিটা শক্ত করে ধরো।'

ছুরি বের করল সে। কাঠের হাতল, বিদ্যুৎ-নিরোধক। এক পোঁচে কেটে ফেলল বাইনের নার্ভ যে জায়গায় থাকার কথা সেখানটা। সাবধানে আঙুল ছোঁয়াল লেজে। শক লাগল না। জোরে চাপ দিল। না, নেই। মুঠো করে চেপে ধরল লেজ। হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। 'অপারেশন সাকসেসফুল!'

বাইনটাকে আবার গর্তে রেখে দেয়া হলো।

আরও কয়েকটা পেইচি ধরা পড়ল সেদিন। খাবার আর পানির সমস্যা নেই। দ্বীপটা ভেঙে না গেলে এটাতে কয়েকদিন টিকে থাকতে পারবে ওরা।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মুসার অসাধারণ। দ্রুত সেরে উঠতে লাগল সে।

পরদিন দূরে একটা ক্যানূ দেখা গেল।

তার পরদিন দেখা গেল বড় বজরাকে। তীরে নোঙর করা।

দূর দিয়ে সরে যেতে লাগল ভাসমান দ্বীপ। হতাশ চোখে নৌকাটার দিকে তাকিয়ে রইল তিনজনে। ক্ষোভে, দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। কুমিরের তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল মুসা, ঠেকাল কিশোর। কুমির ছাড়াও ভয়ঙ্কর পিরানহা আছে নদীতে।

ড্যাম্পকে দেখা যাচ্ছে না। হয়তো বনে ঢুকেছে জানোয়ারগুলোর খাবার জোগাড় করতে। আচ্ছা, কোনটাকে কি খাওয়াতে হয় জানে তো?—ভাবছে কিশোর। যত্ন নিতে পারছে ঠিকমত?

আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল বজরা।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল ওরা, ভাটির দিকে চলছে না আর দ্বীপ।

পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে চওড়া একটা খালের মুখের দিকে। মূল স্রোত থেকে কিভাবে যেন সরে গিয়ে ঘূর্ণিপাকে পড়েছে।

চূড়ান্ত হলো হতাশা। বড় বজরাকে ধরার আশা একেবারে শেষ। চোখের সামনে দিয়ে পাল তুলে শাঁ শাঁ করে পার হয়ে যাবে নৌকাটা, ওরা কিছুই করতে পারবে না। বাঁশ কেটে লগি বানানো যায়, কিন্তু লগি দিয়ে ঠেলে এক চুল নড়াতে পারবে না এত ভারি দ্বীপ।

ভাটির দিকে না গিয়ে পাশে সরে ঘূর্ণাবর্তে পড়েছে কেন দ্বীপটা, বুঝতে পারল কিশোর। বাতাস এখন উজান বইছে। দ্বীপের তুলা গাছে ধাক্কা দিচ্ছে জোরাল বাতাস, ঠেলছে। ভাটিয়াল স্রোতের তোড় কম। বিপরীত স্রোত ঠেলে না পারছে উজানে যেতে, বাতাসের জন্যে না ভাটিতে নামতে পারছে, বেকায়দায় পড়ে পাশে সরতে বাধ্য হয়েছে দ্বীপ।

উজানে বড় বজরাকে আসতে দেখা গেল। পাল নেই। তাতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই, কারণ বাতাস বিপরীত। স্রোতে ভেসে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে নৌকাটা।

আশা জাগল আবার ছেলেদের মনে। দ্বীপের মতই বড় বজরাও যদি বিপথে সরে, ঘূর্ণাবর্তে এসে পড়ে?

ভ্যাম্পের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা মনে হতেই রাইফেলে হাত বোলাল কিশোর।

'জলদি,' বলল সে, 'গাছের আড়ালে লুকাও, সবাই।'

তুলা গাছের ডালপালার আড়ালে লুকাল তিনজনে।

ডালে ঝোলানো হ্যামকগুলোর ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। ভ্যাম্পের নজরেও পড়ে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ওগুলো খুলে আনল।

সরে যাচ্ছে নৌকা। নাহ্, আশা আর নেই। বিপথে পড়েনি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'ইয়াল্লা!'

ঝটকা দিয়ে নৌকার মুখ ঘুরে গেছে। মূল স্রোত থেকে সরে আসতে শুরু করল পাক খেয়ে খেয়ে। পড়েছে ঘূর্ণির টানে!

একটিমাত্র বুলেট রয়েছে রাইফেলে, মিস করতে চাইল না কিশোর। অস্ত্রটা তুলে দিল মুসার হাতে।

ভ্যাম্পকে খুঁজল তিনজোড়া চোখ। নৌকা আরও কাছে এলে দেখা গেল ডেকে শুয়ে আছে সে। নড়ছে না, নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

জন্তু-জানোয়ারের ডাক কানে আসছে। বোঝা যায়, ওরা ক্ষুধার্ত। নাকুর চিঁ-চিঁ, জাগুয়ারের ভারি গোঙানি, আর ময়দার কিচির মিচিরের সঙ্গে যোগ হয়েছে পাখিগুলোর নানারকম ডাক।

বজরার পরিচিত পরিবেশ দেখে ভাল লাগছে তিন গোয়েন্দার। মাস্তুলে ঝুলন্ত শুকনো কিকামুকেও মনে হচ্ছে যেন পরম আত্মীয়। ধ্যানমগ্ন হয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে লম্বু বগা, ভাল লাগছে তাকে। সুন্দর খুদে হরিণ, তাকে ভাল লাগছে। এমনকি

ডাকাত অ্যানাকোণ্ডাকেও এই মুহূর্তে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে ওদের।

দ্বীপের কাছাকাছি চলে এল বড় বজরা, চারপাশে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল, যেন গ্রহের চারপাশ প্রদক্ষিণ করছে একটা উপগ্রহ। কাছে আসছে ধীরে ধীরে। পানির গভীরতা এখানে কম, মাঝে মাঝেই ঘষা লাগছে দ্বীপের তলায়। দ্বীপ ভেঙে যাওয়ার ভয় করছে ছেলেরা।

তবে ভাঙল না। তীরে ঠেকে আটকে গেল। নৌকাটা নাক সোজা করে এসে ধাক্কা খেল দ্বীপের কিনারে, নরম মাটিতে গেঁথে গেল গলুই।

'দারুণ হয়েছে!' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। 'এবার যাওয়া যায়, নাকি?'

'চলো,' বলল কিশোর।

হ্যামকগুলো নিল রবিন। মুসার হাতে রাইফেল। গর্ত থেকে লেজ ধরে বাইনটাকে তুলে নিয়ে এগোল কিশোর।

নিঃশব্দে এসে নৌকায় উঠল ওরা।

অঘোরে ঘুমাচ্ছে ড্যাম্প, কি ঘটছে খবরই নেই।

ড্যাম্পের মাথা সই করে রাইফেল তুলল মুসা। তার হাত চেপে ধরল কিশোর, মাথা নেড়ে ইশারায় বোঝাল, না। অ্যানাকোণ্ডার দিকে তাকাল একবার। ঘুমাচ্ছে। পেট ফোলা, খানাটি হজম হতে দেরি আছে। জ্বলন্ত হলুদ চোখে তার দিকে তাকাল বিগ ব্ল্যাক। মৃদু গোঁ গোঁ করল মিস ইয়েলো। নাকু পাগল হয়ে গেছে, দড়ি ছিঁড়ে চলে আসতে চাইছে। বিরাট লাফ দিয়ে মুসার কাঁধে এসে নামল ময়দা, আদর করে ঠাস ঠাস দুই চাপড় লাগাল গালে।

টলডোর ভেতরে উঁকি দিল মুসা। নড়েচড়ে উঠল বোয়া। তারপর আবার কুণ্ডলীর ওপর মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। পেট এখনও অনেক ফোলা।

কিশোর তাকাল আবার ড্যাম্পের দিকে। চিত হয়ে নাক ডাকাচ্ছে। কোমরের খাপে মুসার বাবার ·৪৫ অটোমেটিক। নিচু হয়ে সাবধানে পিস্তলটা খুলে হাতে নিল সে। আরেক হাতে বাইনটা। শরীর মোচড়াচ্ছে ওটা, নিজের শরীর বেয়েই মাথা ওপরে তোলার চেষ্টা করছে। পারছে না। কয়েক ইঞ্চি উঠেই পড়ে যাচ্ছে আবার।

ড্যাম্প তাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তার পাঁজরে আলতো একটা লাথি লাগানোর লোভ সামলাতে পারল না কিশোর।

'আঁউ! কোন হারামীরে···' চোখ মেলেই স্থির হয়ে গেল ড্যাম্প। চোখে অবিশ্বাস। হাঁ হয়ে গেল মুখ। হাত চলে গেল খাপের কাছে। পিস্তলটা পেল না।

'এই যে, আমার হাতে,' হাসিমুখে পিস্তলটা দেখাল কিশোর।

'তবে রে!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ড্যাম্প। পিস্তল ছিনিয়ে নিতে এগোল।

সরে গেল কিশোর। বাইনটা ছুঁড়ে দিল ড্যাম্পের গলা সই করে।

বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল ডাকাতটা। ঝট করে হাত চলে গেল গলার কাছে। টলছে। কয়েক মুহূর্তের বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়ল পাটাতনের ওপর।

চোদ্দ

ড্যাম্পের গলা থেকে পাটাতনে নামল বাইন। বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল নৌকার কিনারে।

ওটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আর আটকে রেখে লাভ নেই। লেজ ধরে তুলল কিশোর। 'অনেক কষ্ট দিয়েছি, বাইন, কিছু মনে রাখিস না। অনেক উপকার করেছিস আমাদের। গুড বাই।' আলতো করে ছেড়ে দিল পানিতে।

সাপের মত কিলবিল করে উঠল একবার ওটা, শরীরটাকে এক মোচড় দিয়েই তলিয়ে গেল।

'এর একটা ব্যবস্থা করতে হয়,' ড্যাম্পকে দেখাল রবিন। 'হুঁশ ফিরলেই তো গোলমাল শুরু করবে।'

'হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখি,' পরামর্শ দিল মুসা।

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'শাস্তি আরেকটু বেশি পাওনা হয়েছে ওর।'

'কি?'

অ্যানাকোণ্ডার খাঁচার দিকে তাকাল কিশোর। রবিনের দিকে ফিরে বলল, 'দুটো তালা আছে না, বড়টা নিয়ে এসো। আর একটা শেকল, জানোয়ার বাঁধার জন্যে যে এনেছিলাম। তাড়াতাড়ি।'

কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝল না রবিন। প্রশ্নও করল না। কথা না বাড়িয়ে গিয়ে ঢুকল টলডোর ভেতরে। কি করে দেখতেই পাবে।

চুপ করে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে অ্যানাকোণ্ডা, মাথাটা খাঁচার মেঝেতে, শরীরের বেশির ভাগ বাথটাবের ভেতরে। আরামে ঘুমাচ্ছে।

আস্তে করে দরজা খুলল কিশোর। তিনজনে মিলে টেনেহিঁচড়ে ড্যাম্পকে খাঁচায় ভরল।

দরজায় শেকল পেঁচিয়ে তালা লাগিয়ে দিল কিশোর।

ড্যাম্পের মাথার মাত্র এক ফুট দূরে অ্যানাকোণ্ডার বিশাল মাথা।

খুব ধীরে নিঃশ্বাস পড়ছে ড্যাম্পের, চেহারা রক্তশূন্য। হুঁশ আর ফেরে না। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা। মরে যাবে না-তো? বৈদ্যুতিক শক খেলে যা যা করতে হয়, সে-সব করা দরকার?'

খাঁচার দরজা আবার খুলতে যাবে কিশোর, এই সময় শিহরণ খেলে গেল যেন ড্যাম্পের বিশাল কাঠামোটায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বাড়ল, জোরাল হলো। চোখ মেলল সে। চোখের সামনে পড়ে থাকতে দেখল বিশাল কুৎসিত মাথাটা। ভীষণ চমকে গিয়ে এত জোরে উঠে বসল, খাঁচার বাঁশে ঠুকে গেল তার মাথা।

দ্রুত চোখ বোলাল চারপাশে। দেখল, খাঁচায় আটকা পড়েছে।

দরজায় থাবড়া মারল সে। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'খোলো! বেরোব!'

'চুপ,' ঠোঁটে হাত রাখল কিশোর, কৃত্রিম ভয় ফুটিয়ে তুলল চোখেমুখে।

'তোমার দোস্ত জেগে যাবে। ধরে টুক করে গিলে ফেলবে তাহলে।'

'বেরোতে পারলে,' খসখসে কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল ভ্যাম্প, 'খুন করব আমি তোদের!'

'জানি। সেজন্যেই তো আটকে রেখেছি।'

বাঁশ ভাঙার চেষ্টা করল ভ্যাম্প। কিন্তু অ্যানাকোণ্ডারই সাধ্যে কুলোয়নি, সে কি করে পারবে? খানিকক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

নড়ে উঠল সাপের মাথা। খাঁচার বেড়ায় শরীর মিশিয়ে ফেলতে চাইল ভ্যাম্প, রক্তলাল চোখদুটো ছিটকে বেরোবে যেন কোটর থেকে। সাপটার ব্যাপারে তার কোন জ্ঞানই নেই বোঝা গেল, নইলে এত ভয় পেত না। ভরা পেটে ঢোঁড়া সাপের মতই নিরীহ ওই দানব। নেহায়েত ঠেকায় না পড়লে ঘুম থেকেই জাগে না।

গালাগাল শুরু করল ভ্যাম্প।

কান দিল না ছেলেরা।

তাদেরকে ভয় দেখাতে না পেরে সুর পাল্টাল ভ্যাম্প। 'দেখো, রসিকতা অনেক হয়েছে। আর ভাল লাগছে না। আমি জানি, তোমরা খুব ভাল ছেলে। আমি মরে যাই, সেটা নিশ্চয় চাও না?'

'না,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'তাহলে পুলিশের হাতে আর তুলে দিতে পারব না। তোমার যা স্বভাব-চরিত্র, ভাল করতে হলে কিছুদিন জেলে বাস করা প্রয়োজন। তবে তাতেও ভাল হবে কিনা কে জানে।'

'দেখো, তোমরা ছেলেমানুষ, এই জঙ্গলে টিকতে পারবে না আমার সাহায্য ছাড়া। আমি তোমাদের ভালই চাই।'

'তা তো বটেই, আহা!' জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল কিশোর। 'আমাদের বাঁচানোর জন্যে কত দরদ। সে-জন্যেই বুঝি ইনডিয়ানদের কাছে ফেলে নৌকা নিয়ে পালিয়েছিলে?'

'দেখো ভাই, আমাকে ভুল বুঝছ তোমরা। তোমাদের নৌকা আর জানোয়ারগুলোকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম কেবল। ভাল কাজ দেখিয়েছি, তাই না? একটা জানোয়ারও মরেনি। সব ঠিক আছে।'

'তা আছে। মানুষের মত রোজ রোজ খাবার লাগে না বলেই বেঁচে আছে, নইলে কবে মরে ভূত হয়ে যেত। তুমি কি খাওয়ানোর মানুষ?' দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'চলো, অনেক কাজ পড়ে আছে। এটার সঙ্গে বকবক করে লাভ নেই।'

আবার রেগে উঠল ভ্যাম্প। গালাগাল শুরু করল। আওয়াজে সাপটা নড়েচড়ে উঠতেই ভয় পেয়ে থেমে গেল।

জানোয়ারগুলোকে খাওয়াতে লাগল তিন গোয়েন্দা। ওগুলোর হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে, কিচ্ছু খাওয়ায়নি ভ্যাম্প।

'খা,' রক্ত গরম করে রক্তচাটাকে দিতে দিতে বলল কিশোর। 'এই শেষ। ম্যানাওয়ে পৌঁছার আগে আর পাবি না।'

'এত কাছে চলে এসেছি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ। বাতাস পেলে কালই পৌঁছে যাব।'

দুপুরের পর ভাটিয়াল বাতাস শুরু হলো, বাড়ল স্রোতের বেগ। দ্বীপটা চলতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটাও। লগি দিয়ে ঠেলে দ্বীপের গা থেকে নৌকাটাকে ছুটাল তিন গোয়েন্দা। দাঁড় বেয়ে এনে ফেলল মূল স্রোতে। পাল তুলে দিতেই তরতর করে ছুটে চলল নৌকা।

জ্বর ছেড়েছে, পেট ভরে খেয়েদেয়ে আবার সুস্থ হয়ে উঠেছে মুসা। মঞ্চে উঠে হাল ধরে বসল। গান ধরল গুনগুন করে।

সমস্তটা দিন নানারকম ভাবে ছেলেদের মন গলানোর চেষ্টা করল ভ্যাম্প। ফিরেও তাকাল না ওরা। একবার বিশ্বাস করেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

বকাবাদ্যি করে কাহিল হয়ে খাঁচার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল ভ্যাম্প। বড় বড় হাই তুলছে, কিন্তু সাপের ভয়ে চোখ বন্ধ করছে না। ঘুমোলেই যদি সুযোগ পেয়ে তাকে গিলে ফেলে অ্যানাকোণ্ডা।

সাঁঝের বেলা নৌকা পাড়ে ভেড়ালো ছেলেরা। ঘাসে ঢাকা খানিকটা খোলা জায়গা, ক্যাম্প করল সেখানেই।

আগুন জ্বেলে খাবার গরম করে খেল। ভ্যাম্পকেও দিল।

ঠিক হলো, পালা করে পাহারা দেবে রাতে। ভ্যাম্পকে বিশ্বাস নেই। খাঁচার বেড়া খুলে বেরিয়ে আসাটা তেমন কঠিন কিছু না।

হুঁশিয়ার করল কিশোর, 'চুপ করে শুয়ে থাকো। শয়তানী করতে চাইলেই খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দেব সাপটাকে।'

চোখের আগুনে তাকে ভস্ম করার জোর চেষ্টা চালাল ভ্যাম্প। তবে চুপ করে রইল।

সকালে উঠে নাস্তা সেরে আবার নৌকা ছাড়ল ওরা।

দুপুরের আগে নদীর পানির রঙ বদলে গেল, এতদিন ছিল বাদামী, হয়ে গেল কালো। তার মানে ওখানে আমাজনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে কালো নদী রিও নিগ্রো।

'আর দশ মাইল,' বলল কিশোর। নৌকার মুখ ঘোরাতে বলল মুসাকে।

আমাজন থেকে সরে এসে রিও নিগ্রোতে ঢুকল নৌকা। এগিয়ে চলল জঙ্গল শহর ম্যানাওয়ের দিকে। অনেক বছর আগে রবার চাষের স্বর্ণযুগে তৈরি হয়েছিল শহরটা, আটলান্টিক মহাসাগর থেকে হাজার মাইল দূরে। এখন হয়ে গেছে বড় বন্দর।

ছোট-বড় অসংখ্য জলযান দেখতে পেল ছেলেরা। মাল নিয়ে বড় বড় মালবাহী স্টীমার যায় উত্তর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। ওগুলোর পাশে বিরাট বজরাটাকে নগণ্য লাগল। গ্লাসগো থেকে আসা একটা দানবীয় জাহাজের পাশে জেটিতে নৌকা বাঁধল ছেলেরা।

নানারকম জন্তু-জানোয়ার, আর বিশেষ করে অ্যানাকোণ্ডার খাঁচায় তাকাতে

চেহারার বন্দি একজন মানুষ দৃষ্টি আকর্ষণ করল লোকের। ভিড় করে দেখতে এল ওরা।

নৌকা পাহারায় রইল মুসা আর রবিন। কিশোর চলল থানায়।

থানার ইনচার্জকে সব খুলে বলল সে।

প্রথমে তো বিশ্বাসই করতে চাইলেন না ইন্সপেক্টর। শেষে বললেন, 'একটা কাজের কাজই করেছ। চেহারার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে, গাই ক্যাশার। কয়েকটা ডাকাতি আর খুনের মামলার আসামী, হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে পুলিশ। বছর দুই তার কোন খোঁজ পাইনি। শেষবার দেখা গিয়েছিল কোকামায়। লোক দিচ্ছি, নিয়ে যাও সঙ্গে। ধরে নিয়ে আসবে ব্যাটাকে।'

খাঁচা থেকে খুলে ভাম্পের হাতে হাতকড়া পরাল পুলিশ।

স্টীমার অফিসে গেল এরপর কিশোর। জাহাজে নিজেদের জন্যে কেবিন আর জানোয়ারগুলোর জন্যে জায়গা ভাড়া করল।

জাহাজ ছাড়বে তিন দিন পরে।

এই কটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটল তিন গোয়েন্দার। ভাল খাঁচা বানানো, ওগুলোতে জানোয়ারগুলোকে সরানো, জাহাজে তোলা, অনেক কাজ।

নির্দিষ্ট দিনে জাহাজ ছাড়ল।

রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। কালো নদীর কালো পানি দিয়ে ছুটে চলেছে জাহাজ।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'কি ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ভাবছি, জানোয়ার ধরতে এরপর কোথায় যাব।'

'আদৌ যাওয়া হবে কিনা কে জানে। মা কি আর যেতে দেবে?'

'হবে না কেন?' রবিন বলল। 'ব্যবসা যখন, দেবে। তাছাড়া, এবার তো সাকসেসফুল হয়েছি আমরা।'

'বাবার কি অবস্থা, কে জানে?' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'বাবা ভাল হলে যাওয়ার অসুবিধে হবে না। এরপর আফ্রিকা যাব আমরা।'

পাড়ের গভীর অরণ্যের দিকে চেয়ে নীরবে মাথা দোলাল শুধু কিশোর।

*****

তিন গোয়েন্দা সিরিজ

ভীষণ অরণ্য ২

রকিব হাসান

স্বীকারোক্তি:
বাংলা e-book-এর পাঠকেরা ছড়িয়ে আছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে এবং সব জায়গার ইন্টারনেট কানেকশনের গতি সমান নয়। তাই চেষ্টা করতে হয়েছে ফাইলের সাইজ যথা সম্ভব ছোট রাখার। ফলে অনিবার্য ভাবে কমাতে হয়েছে ছবির Resolution. পাঠকের এই অসুবিধার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

Scanned by: Shabab Mustafa

Send your feedback at:
Shabab.mustafa@gmail.com